ইউনিট ৬

ফিক্‌হ শাস্ত্র

মানব জাতিকে সৎপথ প্রদর্শনের জন্য মহান আল্লাহ যুগে যুগে পৃথিবীতে অগণিত নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) হলেন সর্বশেষ নবী। আল্লাহ তাকে মানব জাতির জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান দিয়ে পাঠিয়েছেন, আর তা হল ইসলাম। ইসলামে রয়েছে মানব জীবনের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক তথা সর্ব বিষয়ের সুষ্ঠু ও বাস্তব সমাধান। কুরআন, হাদীস, অতঃপর ইজতিহাদের (কোন বিষয় নিয়ে গবেষণা) মাধ্যমে মহানবী (স) মানব জাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ একটি জীবন ব্যবস্থা রেখে গেছেন।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ইন্তিকালের সময় সাহাবীদের সংখ্যা ছিল একলাখ ত্রিশ হাজারের উর্ধ্বে। তাঁদের মধ্যে মাত্র একশত বিশ হতে একশত ত্রিশজন মুজতাহিদ (শরীআতের বিষয় গবেষক) ছিলেন। সমস্যার উদ্ভব হলে তারা কুরআন-সুন্নাহ ও ইজতিহাদ দ্বারা মতোমতো প্রদান করতেন। সাধারণ সাহাবীদের নিকট কোন মাসআলা পেশ হলে মুজতাহিদ সাহাবীদের নিকট তার জবাব চাইতেন। তাঁরা তার সঠিক জবাব দিতেন।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর যুগে আরবের বাইরে বেশি দূর ইসলাম বিস্তার লাভ করেনি। এছাড়া তাদের তৎকালীন জীবনও ছিল অত্যন্ত সহজ সরল। তাদের প্রয়োজন ও সমস্যা ছিল সীমিতো, যার সমাধানও ছিল সীমিতো। তাই তাদের সামাজিক জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো সর্বযুগের ও সর্ব সাধারণের বোধগম্য করে সম্পাদনা করার প্রয়োজনীয়তাও অনুভুত হয়নি। কিন্তু পরবর্তীতে সাহাবী ও তাবিঈদের যুগে ইসলাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে মুসলমানগণ বিভিন্ন জাতি, সম্প্রদায় এবং বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হন। সে সময় মুসলিম সমাজে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়। মুসলমানদের এ ক্রান্তি লগ্নে তাবিঈদের যুগে একদল সত্যাশ্রয়ী আলিম ও ফকীহ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে এমন একটি সর্বজনীন ইসলামী আইন শাস্ত্র সম্পাদনায় হাত দেন, যা স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সকলের জন্য প্রযোজ্য এবং সকল উদ্ভূত সমস্যার সমাধান প্রদানে সক্ষম। এর পূর্ণাঙ্গ রূপই হল ফিক্‌হ শাস্ত্র।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অপর নামই হল ফিক্‌হ শাস্ত্র। ফিক্‌হ শাস্ত্রের অনুসরণ করলে ইসলামী শরীয়াতের উপর পরিপূর্ণভাবে আমল করা সম্ভব হয় এবং মুসলিম সমাজ ইহ ও পরকারে মঙ্গল লাভ করতে পারে।

আমরা এ ইউনিটে ফিক্‌হ শাস্ত্র সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয় আলোচনা করেছি। আলোচনার সুবিধার্থে বিষয়গুলোকে ৬টি পাঠে ভাগ করা হল।

এ ইউনিটের পাঠগুলো নিম্নরূপ

❖ পাঠ-১ : ফিক্‌হ্ -এর পরিচয়
❖ পাঠ-২ : ফিক্‌হ এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
❖ পাঠ-৩ : ফিক্‌হ শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ
❖ পাঠ-৪ : ইসলামী আইনের উৎসসমূহ
❖ পাঠ-৫ : ইজতিহাদ ও এর প্রয়োজনীয়তা
❖ পাঠ-৬ : ইজতিহাদ ও এর ক্রমবিকাশ

পাঠ-১

ফিক্‌হ -এর পরিচয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- ফিক্‌হ-এর পরিচয় বর্ণনা করতে পারবেন;
- ফিক্‌হ ও শরীয়াতের মধ্যকার পার্থক্য উল্লেখ করতে পারবেন;
- ফিক্‌হ -এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ফিক্‌হ-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য লিখতে পারবেন।

আভিধানিক অর্থ

'ফিকহ্'-এর আভিধানিক অর্থ-কিছু অবগত হওয়া, বুঝা, উপলব্ধি করা, অনুধাবন করা, সূক্ষ্মদর্শিতা।

'ফিক্‌হ'-এর আভিধানিক অর্থ-কিছু অবগত হওয়া, বুঝা, উপলব্ধি করা, অনুধাবন করা, সূক্ষ্মদর্শিতা ইত্যাদি। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْراً مِّمَّا تَقُوْلُ তারা বলল, হে শোয়ায়েব! তুমি যা বলছ তার অধিকাংশই আমরা অনুধাবন করতে পারছি না।" (সূরা হুদ : ৯১)

فقه শব্দটি বাবে سمع হতে নেয়া হয়েছে। ইবনু সাইয়্যেদা বলেন : فقه عنى ما بينت له فقها اذا فهمه অর্থাৎ আমি তাকে যা বলেছি, তা সে বুঝেছে বা অনুধাবন করেছে। فقية শব্দটি ইসমে ফায়েল হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ হচ্ছে: ফিক্‌হ শাস্ত্র বিশারদ। বলা হয়ে থাকে: رجل فقيه অর্থ-একজন আলিম (ফকীহ) ব্যক্তি। কোন বিষয় সম্পর্কিত আলিম ব্যক্তিকেও ফকীহ বলা হয়। উল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়, ফিক্‌হ এর অর্থ হচ্ছে, কোন কিছুর ইলম (জ্ঞান) ও সূক্ষ্মদর্শিতার সাথে তা অনুধাবন করা।

বিভিন্ন باب হতে ব্যবহৃত فقه এর অর্থের পার্থক্য বর্ণনা করতে গিয়ে প্রখ্যাত ভাষাবিদ আল্লামা খায়রুদ্দীন রামালী বলেন, فقه শব্দটি বাবে سمع হতে হলে এর অর্থ হবে সাধারণভাবে কোন কিছুকে উপলব্ধি ও আত্মস্থ করা। আর বাবে فتح হতে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হবে অন্যের তুলনায় স্বল্পতর সময়ে অনুধাবন করা। আর বাবে كرم হতে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হবে ফিক্‌হ শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য অর্জন করা। সুতরাং فقه এর অর্থ হল সে অনুধাবন করল, সে অপরের অপেক্ষা পূর্বে উপলব্ধি করল এবং সে ফিক্‌হ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করল।

ফিক্‌হ-এর পারিভাষিক অর্থ

ফিক্‌হ-এর পারিভাষিক অর্থ হল, ইসলামী আইন-কানুন ও শরীয়াতের সূক্ষ্ম জ্ঞান। রাসূল (সা) বলেন:

من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين

"আল্লাহ যার মঙ্গল চান, তাকে দীনের বিষয়ে সূক্ষ্ম জ্ঞান দান করেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

ফিক্‌হ এর পরিভাষাগত অর্থ সম্পর্কে বিভিন্ন মণীষীর বিভিন্ন অভিমতো রয়েছে, যা নিম্নরূপ-

- আল্লামা সুয়ুতী (র)-এর মতে বিবেক-বুদ্ধি (প্রজ্ঞা) দ্বারা উদঘাটিত জ্ঞানকে শরীয়াতের পরিভাষায় ফিক্‌হ বলে। সুতরাং ফিক্‌হ মূলত: কোন নতুন শাস্ত্র নয়। কুরআন ও সুন্নাহ এর সুগভীরে এর শেকড় প্রোথিত রয়েছে। সত্যাগ্রহী আলিম ও গবেষকগণ খোদা প্রদত্ত স্বীয় বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ও সুক্ষ্মদর্শিতার মাধ্যমে এক বিশেষ পদ্ধতিতে কুরআন ও হাদীস হতে মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধানের জন্য যে সর্বাঙ্গীন ও সর্বজনীন কর্মনীতির উদ্ভাবন করেছেন তাই ইলমে ফিক্‌হ বা ফিক্‌হ শাস্ত্র।

- মিফতাহুস সায়াদার গ্রন্থকার ফিক্‌হ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা লিখতে গিয়ে বলেন:

  هو علم با حث عن الاحكام الشرعية الفر عية العملية من حيث استنبا طها من الا دلة التفصيلية-

  অর্থাৎ ফিক্‌হ এমন একটি শাস্ত্র, যাতে বিস্তারিত দলীল প্রমাণ থেকে নির্গত শরীআতের কর্ম বিষয়ক বিধানাবলি আলোচনা করা হয়।

- আবার কেউ কেউ বলেন الفقه علم بالاحكام الشرعية الفر عية عن ادلتها التفصيلية অর্থাৎ ফিক্‌হ এমন ইলম বা শাস্ত্র যাতে শরীয়াতের এমন বিধি বিধান আলোচিত হয় যা বিস্তারিত দলীল-প্রমাণের সাহায্যে (কুরআন ও সুন্নাহ হতে) উৎঘাটন করা হয়েছে।

  আবার কোন কোন আলিমের মতে : الفقه مجمو عة الاحكام المشروعة فى الاسلام
  ইসলামের বিধি-বিধানগুলো সমষ্টিকে ফিক্‌হ বলা হয়।
  উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণিত হলেও মূলত: এদের ভাব একই।

- মোটকথা, সত্যপন্থী মুজতাহিদগণ স্বীয় প্রজ্ঞা ও বুদ্ধির সাহায্যে আন্তরিক ও একনিষ্ঠ গবেষণার মাধ্যমে মুসলিম মিল্লাতের জন্য যে জীবন যাপন প্রণালী প্রণয়ন করেছেন তার সমষ্টিই হল ইলমে ফিক্‌হ বা ফিক্‌হ শাস্ত্র। আর এটিই ইসলামের আইনশাস্ত্র।

সত্যপন্থী মুজতাহিদগণ স্বীয় প্রজ্ঞা ও বুদ্ধির সাহায্যে আন্তরিক ও একনিষ্ঠ গবেষণার মাধ্যমে মুসলিম মিল্লাতের জন্য যে জীবন যাপন প্রণালী প্রণয়ন করেছেন তার সমষ্টিই হল ইলমে ফিক্‌হ বা ফিক্‌হ শাস্ত্র। আর এটিই ইসলামের আইনশাস্ত্র।

ইলমে ফিক্‌হ -এর বিষয়বস্তু

ইলমে ফিক্‌হ এর বিষয়বস্তু হল : افعال المكلفين من حيث التكليف অর্থাৎ শরীআতের বিধি-বিধান যার উপর প্রযোজ্য এমন বান্দার কার্যাবলি। কেননা ফিক্‌হ শাস্ত্রে বান্দার কার্যাবলির প্রাসঙ্গিক অবস্থার আলোচনা হয়ে থাকে। আর বান্দার কাজ হল-১. ইবাদত, ২. মুআমালাত (লেনদেন), ৩. পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কার্যাবলি ইত্যাদি। এগুলো আবার ১. ফরয, ২. ওয়াজিব, ৩. সুন্নাত, ৪. মুবাহ, ৫. হালাল ও ৬. হারাম ইত্যাদি রূপে বিভক্ত।

সুতরাং বান্দার কাজের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব, মুবাহ, হালাল, হারাম, মাকরূহ ইত্যাদির আলোচনাই হল ইলমে ফিক্‌হ এর موضوع বা আলোচ্য বিষয়।

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

ইলমে ফিক্‌হ এর উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণ অর্জন করা। আর লক্ষ্য হল, আল্লাহ ও বান্দার অধিকারসমূহ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া এবং তদনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করা এবং অন্যদেরকে ঐ অধিকারসমূহ সম্পর্কে জ্ঞাত করা। আর তদনুযায়ী আমল করার জন্য তাদেরকে উৎসাহিতো ও উদ্বুদ্ধ করা। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এতেই নিহিতো রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের অশেষ কল্যাণ।

উল্লেখ্য যে, ইলমে ফিক্‌হকে ইলমে আহকাম, ইলমে ফাতওয়া ও ইলমে আখিরাতও বলে।

ফিক্‌হ ও শরীআতের মধ্যকার পার্থক্য

কেউ কেউ অজ্ঞতা বশত শরীআত ও ফিক্‌হকে একই বিষয় ধারণা করেন। প্রকৃত পক্ষে এ দু'য়ের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তা নিম্নরূপ :

শরীআত বলতে বুঝায়, কুরআনের নুসুস (দলীল), যা ওহীর মাধ্যমে রসুল (স) পেয়েছেন। অনুরূপভাবে শরীআত বলতে সুন্নাহ তথা রসুলের (স) বাণী ও কার্যকলাপকেও বুঝায়। কারণ সুন্নাহ হল, কুরআনের ব্যাখ্যা এবং কুরআনের নির্দেশাবলি কর্মে প্রতিফলন ঘটান। কেননা রাসূল (স)-এর হাদীস ও তাঁর ক্রিয়াকর্ম প্রকৃতপক্ষে তাঁর জীবনে কুরআনী জিন্দেগীর প্রতিফলন। আল্লাহ বলেন:

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ .إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَىٰ

"এবং সে মনগড়া কথা বলে না। এতো ওহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।" (সূরা আন-নাজম:৩-৪)

আর ফিক্হ-এর অর্থ-হচ্ছে, আলিমগণ শরীআতের উদ্ধৃতি হতে যা উপলব্ধি করেন তথা কুরআন ও হাদীসর উদ্ধৃতি'র আলোকে যা গবেষণা করেন এবং ঐ উদ্ধৃতির উপর ভিত্তি করে তাদের গবেষণার নীতি নির্ধারণ করেন।

শরীআত বলতে ইসলামী আকীদাকে বুঝায়, যার সম্পূর্ণটাই সঠিক আর ফিকহ্ হল ফকীহগণের গবেষণা এবং অনুধাবন ও অভিমত। ফকীহর ধারণা শুদ্ধও হতে পারে আবার ভুলও হতে পারে।

সুতরাং শরীআত ও ফিক্হ এর মধ্যকার পার্থক্য প্রতীয়মান হল। শরীআত বলতে ইসলামী আকীদাকে বুঝায়, যার সম্পূর্ণটাই সঠিক এবং যাতে রদবদল নেই। আর ফিক্হ হল ফকীহগণের গবেষণা। যার মাধ্যমে তাঁরা শরীআত অনুধাবন করেন এবং শরীআতের উদ্ধৃতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। অতএব ফিক্হ হল, ফকীহর অনুধাবন ও তাঁদের অভিমতো। ফকীহর ধারণা শুদ্ধও হতে পারে আবার ভুলও হতে পারে। আবার ফকীহগণের বুঝ পরস্পর বিরোধীও হতে পারে। পক্ষান্তরে শরীআতের উদ্ধৃতি সবই সঠিক ও শুদ্ধ। শরীআতের উদ্ধৃতি অকাট্য আর ফিক্হ হল জন্নী বা ধারণা নির্ভর।

নোট করুন

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. ফিক্‌হ মানে হচ্ছে-
   ক. কুরআনের জ্ঞান;
   খ. হাদীসের জ্ঞান;
   গ. কিতাবের জ্ঞান;
   ঘ. শরীআতের সূক্ষ্ম জ্ঞান।

২. বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা উদঘাটিত জ্ঞানকে ফিক্‌হ বলে, এ মতো-
   ক. ইমাম আবু হানীফার;
   খ. আল্লামা সুয়ূতীর;
   গ. ইমাম শাফিঈর;
   ঘ. ইমাম মালিকের।

৩. ফিক্‌হ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হল-
   ক. নবীর সন্তুষ্টি অর্জন;
   খ. জাগতিক শান্তি;
   গ. কবরের শান্তি অর্জন;
   ঘ. আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ অর্জন।

৪. শরীআত বলতে বুঝায়-
   ক. কুরআন ও হাদীসের বাণী;
   খ. রাসূলের আমল;
   গ. কুরআন ও হাদীস অনুধাবন;
   ঘ. দীনের বাহ্যিক আমল।

৫. ফিক্‌হ হল-
   ক. মানুষের আমল;
   খ. ফকীহ এর অনুধাবন ও তার মতো;
   গ. কুরআনের বাণী;
   ঘ. হাদীসের বাণী।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ফিক্‌হ -এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ লিখুন।
২. ফিক্‌হ শাস্ত্রের বিষয়বস্তু আলোচনা করুন।
৩. ফিক্‌হ শাস্ত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য লিখুন।
৪. ফিক্‌হ ও শরীআতের মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. ফিক্‌হ কাকে বলে? ফিক্‌হ ও শরীআতের পার্থক্য নিরূপণ করুন এবং এর বিষয়বস্তু, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিস্তারিত লিখুন।

পাঠ-২

ফিক্‌হ-এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- ফিক্‌হ শাস্ত্রের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- ফিক্‌হ শাস্ত্রের প্রয়োজনীতা সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

ফিক্‌হ শাস্ত্রের সম্প্রসারণ

রাসূলের (স) যুগে ছয়জন সাহাবী ফাতওয়া দিতেন। তাঁর ইন্তিকালের পর সাহাবীগণ ঐ ছয়জনের নিকট ফিক্‌হ শিক্ষা করতে থাকেন।

ফিক্‌হ-এর মতো অন্য কোন ইলম মুসলমানদের নিকট অধিক গুরুত্ব লাভ করেনি। রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময় থেকে শুরু করে প্রত্যেক যুগে ইলমে ফিক্‌হর ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। রাসূল (স) তাঁর সাহাবীদের ফিক্‌হ শিক্ষা দিতেন এবং তাঁদেরকে গবেষণা ও ইজতিহাদের প্রশিক্ষণ দিতেন। রাসূলের (স) যুগে ছয়জন সাহাবী ফাতওয়া দিতেন। তাঁর ইন্তিকালের পর সাহাবীগণ ঐ ৬ জনের নিকট ফিক্‌হ শিক্ষা করতে থাকেন। সাহাবী ও তাবিঈদের মধ্যে তাদের বহু অনুসারী ছিলেন, যারা ফাতওয়ার কাজের জন্য নিয়োজিত ছিলেন।

মদীনা নগরী ওহী-এর প্রাণকেন্দ্র ছিল এবং তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা) পর্যন্ত বেশির ভাগ সম্মানিত সাহাবীদের আবাসস্থল ছিল। পরবর্তীতে মদীনায় অবস্থানরত তাবিঈগণ সাহাবীদের থেকে ইলমে ফিক্‌হ ও হাদীস শিক্ষা করেন।

মদীনায় ৭ জন ফকীহর অত্যন্ত মর্যাদা ছিল। পরবর্তীকালে মদীনায় অবস্থানরত ইমাম মালিকের (র) উস্তাদগণ তাদের (মদীনার ফকীহগণ) থেকে ফিক্‌হ শিক্ষা করেন। ইমাম মালিক তা একত্রিত করে মানুষের মধ্যে প্রচার করতে থাকেন। আর এভাবেই তিনি মালিকী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

এছাড়া খলীফা উমর (রা) কুফা নগরী নির্মাণ করেন এবং সেখানে বহু আরবীয় পণ্ডিতদের আবাসস্থল গড়ে তোলেন। সেখানকার সাধারণ মানুষকে ফিক্‌হ শিক্ষাদানের জন্য আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে (রা) প্রেরণ করেন। পরবর্তীকালে কুফায় বহু বিশিষ্ট সাহাবী তাদের আবাসস্থল গড়ে তোলেন। যাদের সংখ্যা ছিল এক হাজার চারশত। হযরত আলী (রা) তাঁর খেলাফতকালে তথায় মুসলিম বিশ্বের রাজধানী স্থাপন করেন। ঐ সাহাবীগণ কুফা নগরীর সর্বত্র তাঁদের ইলম প্রচার করেন। এতে করে তাবিঈদের মধ্যে তাদের বহু অনুসারী সৃষ্টি হয়। ইবরাহিম আন-নাখয়ী তাদের বিক্ষিপ্ত ইলম একত্রিত করেন।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এ সকল সাহাবী ও তাঁদের অনুসারীদের ইলমসমূহ একত্র করে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তা সংরক্ষণ, সংকলন এবং প্রচার করেন। এভাবে প্রচার ও প্রসার দ্বারা তাঁর ফিক্‌হ মানুষের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। আর তিনি হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। ইমাম আবু হানীফা (র) তাঁর ছাত্রদের নিয়ে একটি ফিক্‌হ বোর্ড গঠন করেন। যে বোর্ডের ফকিহর সংখ্যা ছিল ৪০ জন। তাঁরা প্রক্যেতেই ফিক্‌হ, হাদীস, উলুমুল কুরআন ও আরবি ভাষার উপর মহাপণ্ডিত ছিলেন।

অনুরূপভাবে ইমাম শাফিঈ (র) মক্কার পণ্ডিতদের থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। যাঁদের মধ্যে রয়েছেন মুসলিম ইবনে খালিদ-যিনি ইবনে জুবায়ের ও আতা ইবনে আবি রাবাহ থেকে ইলম শিখেন। তাঁরা ছিলেন ইবনে আবাসের (রা) শিষ্য। অতপর ইমাম শাফিঈর ফিক্‌হ প্রচার ও প্রসার লাভ করে এবং তিনি শাফিঈ মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

এরপর ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) হাম্বলী মাযহাবের ইমাম হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। অবশ্য তিনি তাঁর গবেষণাকৃত মাসআলাগুলো সংকলন করেননি এবং তাঁর ছাত্রদেরকেও এগুলো সংকলনের নির্দেশ দেননি। কারণ একই মাসআলায় তাঁর একাধিক অভিমতো ছিল। পরবর্তীতে তাঁর অনুসারীদের

মুখ থেকে তাঁর মাযহাবের মাসআলা বা রিওয়াআতগুলো সংকলিত হয়।

ফিক্‌হ শাস্ত্রের গুরুত্ব

ইসলামে ফিক্‌হ শাস্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। ফিক্‌হ ইসলামের মূল বা নির্যাস এবং ধর্মের বাস্তব দিক, যাকে ইমাম আবু হানীফা (র) ফিক্‌হে আকবার বলেছেন।

ফিক্‌হর দ্বারাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (স) নির্দেশ মোতাবেক সঠিক ভাবে ইবাদত করা যায়। মুয়ামালাত বা লেনদেন সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দেওয়া যায়, মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা যায় এবং এর দ্বারা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ফিক্‌হর দ্বারাই তাদের মধ্যকার বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, ইসলামী ভাবধারায় পরিবার ও সমাজ গঠন করা যায়। পরিবার ও সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যেমন বিয়ে, তালাক, মিরাস, অসিয়াত তথা পরিবার ও সমাজ জীবনের সকল বিষয় সম্পর্কে অবহিতো হওয়া যায়।

ফিক্‌হর দ্বারাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (স) নির্দেশ মোতাবেক সঠিক ভাবে ইবাদত করা যায়। মুয়ামালাত বা লেনদেন সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দেওয়া যায়, মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা যায় এবং এর দ্বারা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাসূল (স) তাঁর সাহাবীগণকে ফিক্‌হ শিক্ষা দিতে আগ্রহ প্রকাশ করতেন। কোন লোক ইসলামে দীক্ষিত হলে তিনি ঐ ব্যক্তিকে অজু গোসল, নামায ও কুরআন তিলাওয়াতসহ যাবতীয় ইসলামী বিধি-বিধান শিক্ষা দেয়ার জন্য সাহাবীদের হাতে তুলে দিতেন অথবা নিজেই এগুলো শিক্ষা দিতেন। ফিক্‌হ এর দ্বারা ইবাদত তথা- অযু, গোসল, নামায, রোযা হজ্ব, যাকাত প্রভৃতি সকল প্রকার ইবাদত সম্পর্কে অবহিতো হওয়া যায়।

ফিক্‌হই মানুষকে সঠিকভাবে ইবাদত করার পথদির্নেশনা দেয়। ত্বাহারাত, নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাত ইত্যাদির খুটিনাটি নিয়মাবলির বর্ণনা ফিক্‌হ এর মাধ্যমেই পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে লেনদেন সম্পর্কেও ফিক্‌হ-এর মাধ্যমে অবহিতো হওয়া যায়।

রাসূল (স) বলেন : من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين "আল্লাহ যার মঙ্গল চান, তাকে দীনের গভীর জ্ঞান দান করেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

ফিক্‌হ শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা

রাসূল (স)-এর যুগে ফিক্‌হ শাস্ত্রের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না। আর এর প্রয়োজনও ছিল না। কেননা সে সময় যখনই কোন সমস্যার উদ্ভব হতো, সাথে সাথে ঐ ব্যাপারে সরাসরি কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হতো অথবা আল্লাহর ইঙ্গিতে রাসূল (স) তার সমাধান পেশ করতেন। আর সাহাবীগণ তা মেনে চলতেন। কিন্তু রাসূল (স)-এর ইন্তিকালের পর সাহাবীদের আর সে সুযোগ থাকল না। তখন কোন সমস্যা সৃষ্টি হলে সে বিষয়ের সমাধান দিতে তাঁদের নিজেদেরই ইজতিহাদ (গবেষণা) করতে হতো। সাহাবী ও তাবিঈদের যুগে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমা আরব বিশ্বের বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য মুসলমানদের করতলগত হয়। ইউরোপে স্পেন পর্যন্ত, আফ্রিকায় মিশর ও উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত, এশিয়ায় তুরস্ক ও সিন্ধু পর্যন্ত ইসলাম বিস্তার লাভ করে। ফলে ইসলাম নতুন নতুন সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জীবন-জীবিকার সংস্পর্শে আসে। ইসলামী সমাজে নিত্য নতুন সমস্যা ও সংকটের আবির্ভাব ঘটতে থাকে যার সমাধান কুরআন ও হাদীসে সরাসরিভাবে উল্লেখ নেই। ফিক্‌হবিদগণ গবেষণার মাধ্যমে এসবের সামাধান দিতেন।

অপরপক্ষে তখন মুসলমানদের মধ্যেই অভ্যন্তরীণ কোন্দল ক্রমশ ভয়াবহ আকার ধারণ করে। খিলাফতে রাশিদার শেষের দিকেই মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক ও আকীদাগত কোন্দল আরম্ভ হয়। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের পাশপাশি শিয়া, খারেজী, রাফেযী, মুতাযিলা ইত্যাদি বাতিল সম্প্রদায়গুলোর অভ্যুদয় ঘটে। তারা সর্ব সাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি ও গোলযোগ সৃষ্টির প্রয়াস পায়। এমন কি বানু উমাইয়া যুগের মাঝামাঝি সময় সত্যপন্থী মুসলিম আলিমগণও দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন। যা নিম্নরূপ-

ক. **আহলুল হাদীস :** যারা শুধু কুরআন ও সুন্নাহর প্রকাশ্য বর্ণনানুযায়ী আমল করা জরুরি মনে করেন এবং রায়, গবেষণা ও কিয়াসের সাহায্যে মাসআলার উপর চিন্তা গবেষণা করা থেকে বিরত থাকেন। এদের পূর্বসূরী সাহাবীগণ ছিলেন হযরত আব্বাস, যুবায়ের, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ও আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবন আস (রা) প্রমুখ। হিজাযবাসীগণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মাসআলা ও আহকাম প্রণয়নে নয় শুধু হাসীদের উপর নির্ভর করতেন। আর হিজাযই ছিল হাদীসের মূল

কেন্দ্রস্থল। হিজাযবাসীগণ মনে করতেন, সকল বিষয়ে সমস্যা সমাধানের জন্য হাদীসই যথেষ্ট, যুক্তি বা কিয়াসের প্রয়োজন নেই।

খ. **আহলুর রায় (যুক্তিবাদী) :** তারা কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানের সাথে বুদ্ধিবৃত্তি (প্রজ্ঞা) প্রয়োগকে জরুরি মনে করেন। আহলে হাদীসগণ ভবিষ্যতের সম্ভাব্য মাসআলাগুলো সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করতে পছন্দ করতেন না। পক্ষান্তরে যুক্তিবাদীগণ সম্ভাব্য মাসআলাগুলোর ব্যাপারেও চিন্তা ভাবনা করতেন। পরবর্তী যুগে ইব্রাহীম আন-নাখয়ী ও ইমাম আবু হানীফার আগমন ঘটে। তাঁদের মতে শরীআতের সকল আহকাম যুক্তি সম্বলিত, যার মধ্যে মানুষের মঙ্গল নিহিতো আছে। তাঁরা প্রতিটি বিধানের কারণ ও তাঁর উসূল বা মূলনীতি বের করতেন। যার উপর ভিত্তি করে তারা নতুন নতুন মাসআলা প্রণয়ন করতেন। এভাবে ইরাক নগরী আহলুর রায় বা যুক্তিবাদীদের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়।

এর ফলে আহলুল হাদীস ও আহলুর রায় এর মধ্যে সামান্য বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। তবে এ মতোবিরোধের বেলায় শিয়া ও খারেজীদের মতো তাদের মধ্য কোন প্রকার বিদআতের অনুপ্রবেশ ঘটেনি।

চার মাযহাবের ইমামগণ ইসলামী শরীআত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে একই পরিবারভুক্ত লোকদের মতো ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কোন প্রকার বৈরিভাব ছিল না। তাঁরা একে অপরের মতামত গ্রহণ করতেন। শুধু তাই নয়, তাঁদের গবেষণা লব্ধ মাসআলার প্রায় দুই তৃতীয়াংশের মধ্যে ঐকমত্য ছিল।

প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের ইমামগণ ইসলামী শরীআত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে একই পরিবারভুক্ত লোকদের মতো ছিলেন। তাদের মধ্যে কোন প্রকার বৈরিভাব ছিল না। তাঁরা একে অপরের মতোমতো গ্রহণ করতেন। শুধু তাই নয়, তাঁদের গবেষণা লব্ধ মাসআলার প্রায় দুই তৃতীয়াংশের মধ্যে ঐকমত্যে ছিল। বাকী এক তৃতীয়াংশের মধ্যে কারো কারো কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করার ফলে এবং ফাতওয়ার স্থানকাল পাত্র ভেদে কিছুটা মতো বিরোধ পরিলক্ষিত হয়।

এছাড়া যে সব মাসআলার ক্ষেত্রে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে মতোবিরোধ রয়েছে তার কারণ হল, কোন মাসআলায় কারো নিকট সে দলীলটি অধিক গ্রহণযোগ্য, যার ব্যাপারে অন্য ইমামের নিকট সংশয় ছিল। আবার কারো নিকট কোন মাসআলা সহজতর মনে হয়েছে, যা অন্যের কাছে কঠিন মনে হয়েছে।

ইমামদের মধ্যে মতোবিরোধের কারণ

প্রকৃতপক্ষে আহলুর রায়গণ কখনো সহীহ হাদিসের উপর রায়কে প্রাধান্য দেননি। এ সম্পর্কে ইমাম শাফিঈর উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, মুসলমানগণ এ কথার উপর ঐকমত্যে পোষণ করেছেন যে, যার নিকট রাসূলের (স) কোন সহীহ হাদীস রয়েছে তাঁর পক্ষে কখনো রাসূলের (স) হাদীস বাদ দিয়ে কারো কথা গ্রহণ করা অসম্ভব। আর এটা কল্পনাও করা যায় না যে, তারা রাসূলের (স) হাদীসের বিরোধিতা করবে। তবে যদি কাউকে দেখা যায় আপাত দৃষ্টিতে সে রাসূলের (স) কোন হাদীস ছেড়ে দিয়েছেন, তাহলে এর কারণ হয়ত তার নিকট ঐ হাদীসটি পৌঁছেনি, অথবা তার নিকট ঐ হাদীস পৌঁছেছে কিন্তু তার বর্ণনাকারী দুর্বল বলে প্রমাণিত। যদিও ঐ হাদীস অন্যদের নিকট সহীহ বলে প্রমাণিত অথবা অন্যদের নিকট যে হাদীস পৌঁছেছে তার নিকট ঐ হাদীসের বিপরীতে হাদীস পৌঁছেছে।

এখানে আমরা একটি উদাহরণ বর্ণনা করছি, যাতে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, উভয় দলই (ফকীহ ও আহলুল হাদীস) প্রকৃত পক্ষে হাদীসের উপরই আমল করেছেন। তবে ইজতিহাদের বেলায় তাদের প্রত্যেকের অভিমতো ভিন্নরূপ। যাদের নিকট যে হাদীস সহীহ বলে প্রমাণিত হয়েছে, তারা সেই হাদীসের উপরই আমল করেছেন। উদাহরণটি নিম্নরূপ:

ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আওযায়ী (র) একদা মক্কায় মিলিত হন। তখন ইমাম আওযায়ী (র) ইমাম আবু হানীফাকে বললেন, আপনারা নামাযের রুকুতে ও রুকু হতে মাথা উত্তোলনের সময় হাত উঠান না কেন? ইমাম আবু হানীফা উত্তরে বলরেন, এ দু'অবস্থায় হাত উঠান সম্পর্কে রাসূল (স) হতে কোন সহীহ হাদীস নেই। তখন আওযায়ী (র) বললেন, আপনি কি করে একথা বললেন? অথচ আমার নিকট যুহরী, ইমাম সালিম ইবন ওমর এর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন যে, "রাসূল (স) নামাযের শুরুতে তাকবীরে তাহরীমার সময়, রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু হতে মাথা উত্তোলনের সময় হাত উঠাতেন।"

ইমাম আওযায়ী (র) আরও বললেন, আমার হাদীসের সনদে রয়েছেন ইমাম যুহরী, সালিম ও ইবনু

ওমর। পক্ষান্তরে আপনার হাদীসের সনদে রয়েছেন, হাম্মাদ, ইব্রাহীম, আলকামা ও ইবনে মাসউদ। এখন কার সনদ উত্তম? তখন ইমাম আবু হানীফা বললেন, হাম্মাদ, যুহরী অপেক্ষা এবং ইব্রাহীম, সালিম অপেক্ষা বড় ফকীহ। এছাড়া আলকামা ইলম ও ফিকহের দিক থেকে ইবনে ওমর অপেক্ষা কোন অংশে কম নন। যদিও ইবনে ওমর রাসূলের (স) সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। আর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের তো কোন কথাই নেই। তিনি রাসূলের (স) যুগ হতেই বিশিষ্ট ফকীহ হিসেবে খ্যাত ছিলেন। তখন আওযায়ী চুপ করে গেলেন।

অতএব দেখা যাচ্ছে, হিজাযবাসী ও ইরাকবাসীগণ উভয়ই হাদীসকে প্রাধান্য দিতেন। তবে কোন হাদীস এক দলের নিকট সহীহ বলে প্রমাণিত হলে, তা অন্য দলের নিকট সহীহ বলে গণ্য হতো না। ফলে বিভিন্ন মাসআলায় ও ফাতওয়ায় তাদের পরস্পরের মধ্যে সামান্য মতোবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। এ জন্য আমরা কোন পক্ষকে দায়ী করতে পারি না।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. আল্লাহ যার মঙ্গল কামনা করেন তাকে তিনি
   ক. ধন-সম্পদ দেন; খ. অধিক সন্তান দেন;
   গ. দ্বীনের জ্ঞান দেন; ঘ. সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করেন।

২. রাসূলের যুগে কতজন সাহাবী ফাতওয়া দিতেন?
   ক. ২০ জন; খ. ৫০ জন;
   গ. কেউ দিতেন না; ঘ. ৬ জন।

৩. প্রসিদ্ধ চার ইমাম ইসলামী শরীয়াতের প্রচার ও প্রসারে-
   ক. একই পরিবারভুক্ত ছিলেন; খ. তাঁদের মধ্যে চরম মতোবিরোধ ছিল;
   গ. একে অপরের শত্রু ছিলেন; ঘ. তাঁদের মধ্যে মারামরি লেগে থাকত।

৪. ইমাম আবু হানীফার গবেষণা বোর্ডে কতজন ফকীহ ছিলেন?
   ক. ৬০ জন; খ. ৯০ জন;
   গ. ৩০ জন; ঘ. ৪০ জন।

৫. আহলুর রায়-এর কেন্দ্রস্থল ছিল-
   ক. মদিনা; খ. মক্কা;
   গ. ইরাক; ঘ. ইয়ামান।

সংক্ষিপ্ত রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. ইলমে ফিক্‌হ-এর গুরুত্ব আলোচনা করুন।
২. ফিক্‌হ শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা লিখুন।
৩. আহলুর রায় -এর গবেষণা সম্পর্কে লিখুন।
৪. আহলুল হাদীসের মাসআলা প্রদান সম্পর্কে বর্ণনা দিন।
৫. আহলুর রায় ও আহলুল হাদীসের মতোবিরোধ সম্পর্কে লিখুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. ফিক্‌হ শাস্ত্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।
২. চার ইমামের মাসআলা গবেষণা সম্পর্কে লিখুন।
৩. আহলুর রায় ও আহলুল হাদীসের মধ্যে মতোবিরোধ ছিল কি? বিস্তারিত লিখুন।

পাঠ-৩

ফিক্‌হ শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- রাসূলের (স) যুগে ফিক্‌হ শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- সাহাবীদের যুগে ফিক্‌হ শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- তাবিঈদের যুগে ফিক্‌হ শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- বিভিন্ন ইমামদের যুগে ফিক্‌হ শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- গবেষণার পূর্ণতা ও তাকলীদের যুগ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

রাসূলের যুগে ফিক্‌হ শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

মহানবীর (স) আবির্ভাবের পূর্বে আরবের লোকেরা জাহিলিয়াতের মাঝে নিমজ্জিত ছিল। তাদের না ছিল কোন ধর্ম, না ছিল কোন আইন-কানুন। তারা বিভিন্ন প্রকার কুসংস্কারে লিপ্ত ছিল। তাদের অবস্থাকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

১. ধর্মের দিক থেকে তারা ছিল পৌত্তলিক। ২. সমাজের দিক থেকে তাদের মধ্যে ছিল নানা রকম বিশৃংখলা। ইসলামের আবির্ভাবের পর প্রয়োজন ছিল তাদেরকে প্রথমতো: এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে ফিরিয়ে আনা। দ্বিতীয়ত: তাদের অন্তরে সচ্চরিত্রের বীজ বপন করা। আর তাদের জন্য একটি বিধান প্রণয়ন করা যা হবে তাদের ইহ-পরকালের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান।

ইসলাম প্রথমতো তাদের আকীদা ও বিশ্বাস সংশোধন করে। কেননা আকীদা শুদ্ধ হলে, মানব জীবনের বাকী সকল কাজ সহজ সাধ্য হয়ে যায়।

মহানবী (স) নবুওয়াত প্রাপ্তির পর মক্কী জিন্দেগীতে সুদীর্ঘ তের বছর যাবৎ আল্লাহর নির্দেশে মানুষদেরকে আল্লাহর একত্ববাদের দিকে ডাকেন এবং শিরক থেকে ভীতি প্রদর্শন করেন। আর তাদেরকে ঈমানের বাকী দিকগুলো যেমন: পরকাল, নবুওয়াত এবং ইসলামী মূল আকীদা বিশ্বাসের দিকে আহবান করেন।

এছাড়া রাসূলের (স) মক্কী জীবনে ইবাদত ও আখলাকের দিকেও জোর দেওয়া হয়। যখন মুসলমানদের আকীদা সুদৃঢ় হয় তখন আল্লাহ প্রথমতো মুমিনগণকে, অতপর রাসূল (স)-কে মদীনায় হিজরতের নির্দেশ প্রদান করেন। এতেঠদিন মক্কায় শরীআতের বিধান ছিল সীমিতো। কিন্তু মদীনায় হিজরতের পর মুসলমানদের নতুন জীবন শুরু হয়। তাদের জন্য এমন বিধিবিধান প্রণীত হয়, যা তাদের জীবনের সকল দিককে অন্তর্ভুক্ত করে। যার মধ্যে রয়েছে ইবাদত, লেনদেন, জিহাদ, উত্তরাধিকার আইন, অপরাধ দমন আইন, অসিয়াত, বিবাহ, বিচ্ছেদ ও বিচারকার্য তথা ইলমে ফিক্‌হ বিষয়ক সকল প্রকার বিধান।

রাসূলের (স) আমলে কোন মাসআলা বা সমস্যার উদ্ভব হলে রাসূল (স) কুরআনের আয়াত দ্বারা সমাধান দিতেন আবার কখনো তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী অথবা তাঁর কর্ম দ্বারা সমাধান দিতেন।

রাসূলের (স) আমলে কোন মাসআলা বা সমস্যার উদ্ভব হলে রাসূল (স) কুরআনের আয়াত দ্বারা সমাধান দিতেন আবার কখনো তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী অথবা তাঁর কর্ম দ্বারা সমাধান দিতেন। কেননা হাদীস হল কুরআনের ব্যাখ্যা। আবার কখনো সাহাবীগণ নিজেদের রায় দ্বারা সমস্যার সমাধান দিতেন। তাঁদের ইজতিহাদ-গবেষণা শুদ্ধ হলে তিনি অনুমোদন দিতেন। অন্যথায় তাদেরকে সঠিক রাস্তা বাতলিয়ে দিতেন।

শরীআত প্রণয়নের ব্যাপারে রাসূলের (স) যুগে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষণীয়

প্রথম বিষয় : শরীআত প্রণয়নের ভার একমাত্র রাসূলের (স) উপরই ছিল। এতে অন্য কারো দখল ছিল না। তিনি কখনো কুরআন দ্বারা এবং কখনো হাদীস দ্বারা শরীআতের সকল প্রকার

সমস্যার সমাধান দিতেন। সুতরাং তখন শরীআতের বিধানাবলির মধ্যে কোন মতিবিরোধ পাওয়া যেত না।

দ্বিতীয় বিষয় : আয়াতুল আহকাম বা বিধান সম্পর্কিত আয়াতসমূহ উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অথবা সাহাবীদের কোন প্রশ্নের জবাবে অথবা কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হতো।

তৃতীয় বিষয় : সমগ্র ইসলামী ফিক্‌হ একসাথে সম্পাদিত হয়নি। বরং কুরআন ও সুন্নাহ যে ভাবে অবস্থা ও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সম্পন্ন হয়েছে, অনুরূপভাবে ফিক্‌হ শাস্ত্রও কুরআন-সুন্নাহর মতো বিভিন্ন সময় ও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সম্পাদিত হয়েছে। শরীয়াতের আহকাম প্রণয়নের ব্যাপারে রাসূল (স) শুধু কুরআননের উপরই নির্ভর করেননি; বরং তিনি নিজেও বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করেছেন। আবার সাহাবীগণকেও গবেষণার নির্দেশ দিয়েছেন।

চতুর্থ বিষয় : রাসূলের (স) সময়কালে শরীআতের বিধানাবলি প্রণয়ন পরবর্তীকালের ফকীহদের মতো ছিল না। বরং তিনি মৌলিক নীতিমালার ভিত্তিতে বিধানাবলি প্রণয়ন করতেন। আবার কখনো এর ইল্লত বা কার্যকারণ বর্ণনা করতেন। পক্ষান্তরে ফকীহদের যুগে প্রত্যেকেই নিজের উসূল (اصول) বা মূলনীতির উপর ভিত্তি করে আহকাম প্রণয়ন করতেন। তাঁদের পরস্পরের উসূল ছিল পৃথক পৃথক। ফলে তাঁদের মধ্যে মতোবিরোধ পরিলক্ষিত হয়।

রাসূল (স) মৌলিক নীতিমালার ভিত্তিতে বিধানাবলি প্রণয়ন করতেন। পক্ষান্তরে ফকীহদের যুগে প্রত্যেকেই নিজের উসূল বা মূলনীতির উপর ভিত্তি করে আহকাম প্রণয়ন করতেন।

সাহাবীদের যুগে (খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ) ফিক্‌হ শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

ইতোপূর্বে আমরা অবগত হয়েছি যে, রাসূলের (স) যুগে ফাতওয়া ইত্যাদির মূল উৎস ছিল, কুরআন ও সুন্নাহ। কিন্তু তাঁর তিরোধানের পর বিশিষ্ট সাহাবীগণের উপর এ দায়িত্ব অর্পিত হয়। আরবের বাইরে ইসলামী সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটে এবং মিশর, সিরিয়া, ইরান ও ইরাক তাঁদের করতলগত হয়।

সাহাবীদের সম্মুখে নতুন নতুন মাসআলা ও সমস্যার উদ্ভব হলে তাঁরা কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে উহার সমাধান দিতেন। আর কুরআন ও সুন্নাহ হতে তার সরাসরি সমাধান না পেলে, শাখা-প্রশাখা ও খুঁটিনাটি বিষয়ে সমাধানের জন্য গবেষণা করে ফাতওয়া প্রদান করতেন। রাসূল (স) তাদেরকে এ গবেষণার অনুমোদন দিয়ে গেছেন। তাঁদের যুগে গবেষণা ও কিয়াস প্রয়োগে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান শুধু উদ্ভূত ঘটনাবলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবে তখন যে সকল সমস্যার উদ্রেক হয়নি, পরবর্তী গবেষক ইমামগণের মতো আগামী দিনের কথা লক্ষ করে সে সবের সমাধান দিয়ে যাননি। বরং তাঁদেরকে যে সব সমস্যার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে এবং যা তাঁরা দেখেছেন সেগুলার ফাতওয়া দিয়ে ক্ষান্ত হয়েছেন। কেননা তাঁরা মনে করতেন-

ক. অতিরিক্ত বিষয় বা যা সংঘটিত হয়েনি এমন বিষয় সম্পর্কে ফাতওয়া প্রদান কালক্ষেপণ মাত্র।

খ. তাঁরা তাকওয়া ও সতর্কতা বশতঃ ফাতওয়া প্রদানে তত উৎসাহী ছিলেন না। কারণ ফাতওয়ায় ভুল ভ্রান্তি ও পদস্খলন ঘটতে পারে।

গ. তৎকালে ফকীহ ও গবেষক সাহাবীগণ ছিলেন চার খলীফা ও তাঁদের নিকটবর্তীগণ। তাঁরা বেশীর ভাগ সময় ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলমানদের ব্যবস্থাপনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। ফলে আগামী দিনে কি জাতীয় সমস্যার উদ্ভব হবে তার সমাধান দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁদের ছিল না।

- খলীফা আবু বকরের (রা) আমলে কোন সমস্যার উদ্ভব হলে তিনি কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা সমাধান দিতেন। তাঁর জানা মতে কুরআন ও সুন্নাহতে উহার সমাধান না পেলে সাহাবীদের জিজ্ঞেস করতেন। তাঁদের কেউ কুরআন ও সুন্নাহ হতে উহার দলীল উপস্থাপন করতে পারলে তিনি সে হিসেবে ফাতওয়া প্রদান করতেন। অন্যথায় বিশিষ্ট সাহাবীদের একত্রিত করে তাঁদের পরামর্শ নিতেন। কোন মাসআলার উপর তাঁদের ঐকমত্যে হলে তিনি সে হিসেবে ফাতওয়া দিতেন।
- হযরত উমর (রা) তাঁর আমলে নতুন কোন বিষয়ের সমাধান বা ফাতওয়া দিতে গিয়ে প্রথমতো কুরআন-সুন্নাহ হতে দলীল খুঁজতেন। কুরআন ও সুন্নাহ হতে না পেলে তাঁর পূর্বসূরী আবু বকরের (রা) ফয়সালা হিসেবে ফাতওয়া দিতেন। আর তাও সম্ভব না হলে সাহাবীদের একত্র করে তাদের মতোমতো চাইতেন। যখন কোন সিদ্ধান্তের উপর তাঁদের ঐকমত্যে হতো, তিনি ঐ হিসেবেই

ফয়সালা দিতেন।

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা এটাই প্রতিয়মান হয় যে, সাহাবীগণ ফাতওয়ার ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস প্রয়োগ করতেন।

তাবিঈদের যুগে ফিক্‌হ শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

এ যুগ বলতে খুলাফায়ে রাশিদীনের পর হতে দ্বিতীয় শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত বুঝানো হয়েছে। সাহাবীগণ রাসূল (স)-এর হাতে প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন এবং তাঁর থেকে সরাসরি জ্ঞান অর্জন করেছেন। অনুরূপভাবে তাবিঈগণ সাহাবীগণের হাতে প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন এবং তাঁদের কাছে ফিক্‌হ ও ফাতওয়া শিখেছেন। তাবিঈগণ যে সব সাহাবী থেকে ইলম ও ফিক্‌হ শিক্ষা করেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, যায়েদ ইবনে ছাবেত ও আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) প্রমুখ।

তাবিঈগণ সাহাবীগণের অনুসরণে ফাতওয়া প্রদান করতেন। তাঁরা ফাতওয়া প্রদানে প্রথমতো কুরআন ও সুন্নাহর অনুরসণ করতেন। কুরআন ও সুন্নাহ হতে তাদের ফাতওয়ার দলীল না পেলে সাহাবীদের গবেষণার উপর আমল করতেন। আর তাও সম্ভব না হলে নিজেরা গবেষণা করতেন।

গবেষক ইমামদের যুগে ফিক্‌হ শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

ইমামদের যুগ বলতে হিজরী দ্বিতীয় শতকের শুরু হতে চতুর্থ শতকের মাঝামাঝি সময়কে বুঝানো হয়েছে। এ যুগ ছিল গবেষক ইমামদের যুগ এবং ফিক্‌হ শাস্ত্র হতে শুরু করে বিভিন্ন ইলম-এর সংকলন ও গবেষণার যুগ। এ যুগ আব্বাসীয় যুগের পরিপক্কতার সময় পর্যন্ত চলতে থাকে। চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে আব্বাসীয় সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়লে এ যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে। হিজরী দ্বিতীয় শতকে মুসলমানগণ এমন কাজে হাত দেন, যা তাঁদের পূর্বসূরীগণ করেননি। তাঁরা ফিক্‌হ শাস্ত্র হতে শুরু করে অন্যান্য ইসলামী জ্ঞান যেমন: উলূমুল হাদীস, উলুমুল কুরআন, উলুমুল আরাবিয়াহ ইত্যাদি সংকলন ও সংরক্ষণ শুরু করেন। এ যুগে মুসলিম বিশ্বে তেরজন বিশিষ্ট ফকীহ ও মুজতাহিদের আবির্ভাব ঘটে। যাঁদের মাযহাবসমূহ বই আকারে সংকলিত হয় এবং যারা অনুসরণীয় হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে ফিক্‌হ শাস্ত্রের ইমাম হিসেবে পরিগণিত হন। তারা হলেন, মক্কায় সুফিয়ান সাওরী, সিরিয়ায় আওযায়ী, মিশরে শাফিঈ ও লাইস ইবনে সায়াদ, নিসাপুরে ইসহাক ইবন রাহওয়াই, বাগদাদে আবু ছাওর, আহমাদও ইবনে জারীর। পরবর্তীকালে তাঁদের কারো কারো মাযহাব এর বিলুপ্তি ঘটে। আবার কারো মাযহাব উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসার ও প্রচার লাভ করেনি, আবার কারো কারো মাযহাব উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসার লাভ করে। যেমন: ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালিক (র)-এর মাযহাব।

হিজরী দ্বিতীয় শতকে মুসলমানগণ ফিকহ্ শাস্ত্র হতে শুরু করে অন্যান্য ইসলামী জ্ঞান যেমন: উলূমুল হাদীস, উলুমুল কুরআন, উলুমুল আরাবিয়াহ ইত্যাদি সংকলন ও সংরক্ষণ শুরু করেন।

মোটকথা হচ্ছে, এ যুগ ছিল ইসলামী গবেষণা ও সংকলনের যুগ। এ যুগকে ফিক্‌হ শাস্ত্রের স্বর্ণ যুগ বলা হয়। এ যুগে মুসলমানগণ ইসলামী গবেষণার শীর্ষ শিখরে পৌঁছেন। বিশেষ করে ফিক্‌হ শাস্ত্রের উপর বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থ প্রণীত হয়, যা মুসলমানগণ আজ পর্যন্ত অনুসরণ করে আসছেন।

এ যুগের ফকীহ ও মুজতাহিদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন চারজন। তাঁরা হলেন, ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)। আবার এ চারজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন ইমাম আবু হানীফা, যাঁকে ইমাম আযম বলা হয়।

ইমাম আবু হানীফা (রা) সর্বপ্রথম নিয়মতোান্ত্রিক পদ্ধতিতে ফিক্‌হ শাস্ত্রের গোড়াপত্তন করেন। আর স্বীয় জীবনে এর পূর্ণতাও দান করেন। তারপর অন্যান্য ফকীহ ও ইমামগণ স্ব-স্ব ফিক্‌হ সম্পাদনা করেন। এ সময় ফিক্‌হ-এর উপর স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচিত হয়। এটাই ফিক্‌হ-এর সম্পাদনার যুগ।

এ যুগের কতিপয় বিশিষ্ট ফিক্‌হবিদদের মাযহাব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক তাঁদের ফিক্‌হ এর অনুসরণ শুরু করেন। বিচারকগণ ফিক্‌হ মোতাবেক ফয়সালা দিতে থাকেন। জনসাধারণ ফিক্‌হ এর অনুসরণ শুরু করেন। জনসাধারণ বিশেষ বিশেষ ইমামের অনুসরণ আরম্ভ করেন। এ সময় গবেষণার দ্বার সকলের জন্যই উন্মুক্ত ছিল। এছাড়া ক্ষমতোসীন ব্যক্তি ফিক্‌হ শাস্ত্র এবং ফকীহদের যথেষ্ট মুল্যায়ন করতেন। এ সময় বিশিষ্ট ইমামদের কতিপয় প্রসিদ্ধ গবেষক শিষ্যও জুটে যায়। তারা স্বীয় উস্তাদের ফিক্‌হ এর উপর গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁদের মতোমতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন। তাঁদের মূলনীতির উপর মাসআলা উদ্ভাবন করেন। এভাবে গবেষক ইমামদের যুগে ইলমে ফিক্‌হ উল্লেখযোগ্য

ব্যাপকতা লাভ করে।

গবেষণার পূর্ণতা ও তাকলীদ (অনুকরণ)-এর যুগ

হিজরী চতুর্থ শতক থেকে শুরু করে ৬৫৬ হিজরীতে বাগদাদের পতন পর্যন্ত সময় হল গবেষণার পূর্ণতা ও তাকলীদের যুগ। এ যুগে গবেষণার পরিসমাপ্তি ঘটে। পূর্ববর্তী যুগের বিশিষ্ট ইমামগণের ফিক্‌হর উপর বৃহদাকার গ্রন্থরাজি রচিত হয়। সাধারণ লোকদের মতো আলিমগণও বিশেষ বিশেষ ইমামের তাকলীদ (অনুকরণ) আরম্ভ করে দেন। তারা পূর্ববর্তী ইমামগণের নির্ধারিত মূলনীতি অবলম্বন করে গবেষণা ও মাসআলা উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করেন।

এ যুগে বিশেষ মাযহাবের পক্ষে ফিক্‌হ গ্রন্থ রচনার ধারা তৈরি হয়। পরিশেষে চার ইমাম তথা ১. ইমাম আবু হানীফা (র), ২. ইমাম শাফিঈ (র), ৩. ইমাম মালিক (র) ও ৪. ইমাম আহমাদ (র) এর মতোমতের তাকলীদ বা অনুসরণ করার ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের প্রায় সকলেই ঐকমত্যে পোষণ করেন।

এ যুগ তাকলীদের যুগ। তাকলীদ হল, কোন নির্দিষ্ট ইমামের উদ্ভাবিত মাসআলা ও বিধানগুলোর জ্ঞান লাভ করা এবং সে গুলোকে শরীআত প্রণেতার প্রদর্শিত বিধান হিসেবে মেনে নেওয়া। আর সেগুলোর অনুসরণকে অত্যাবশ্যকীয় করে নেওয়া। অবশ্য শীর্ষ স্থানীয় তাবিঈদের যুগ হতে আরম্ভ করে ফিক্‌হ শাস্ত্র সম্পাদনা পর্যন্ত প্রত্যেক যুগেই গবেষক এবং অনুসরণকারীর অস্তিত্ব ছিল। মুজতাহিদ বা গবেষক হলেন ঐসব ফকিহ্‌গণ যারা কিতাব ও সুন্নাহর জ্ঞান লাভ করে তা হতে আহকাম উদ্ভাবনে সক্ষম ছিলেন। আর সর্বসাধারণ, যারা কিতাব ও সুন্নাহ হতে আহকাম উদ্ভাবনে সক্ষম ছিলেন না তারা মাসআলা সমাধানের জন্য কোন ফকীহ এর দ্বারস্থ হতেন। তিনি তাদের সমস্যার সামাধান দিতেন। এ যুগে লোকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে অনুকরণ-অনুসরণ স্পৃহা বিস্তার লাভ করে। আলিম ও জনসাধারণ সকলেই অনুকরণ প্রবণ হয়ে পড়েন। পূর্ববর্তী যুগের ফিক্‌হ শাস্ত্রের কোন শিক্ষার্থী প্রথমতো কুরআন ও সুন্নাহর স্মরণাপন্ন হতেন, যা মাসআলা উদঘাটনের মূল উৎস ছিল। এ যুগে ফিক্‌হ এর শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট কোন ইমামের মাযহাবী গ্রন্থ অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করতেন। আর ফিক্‌হ এর কিতাবগুলো মোটামুটি আয়ত্ত করতে পারলেই তিনি ফকীহ হিসেবে গণ্য হতেন। তাদের এক দল উদ্যোগী আলিম স্বীয় ইমামের মাযহাবের উপর গ্রন্থ সংকলন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ গুলো মূলত পূর্ববর্তী ইমামগণের রচিত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত রূপ। তারা ইমামগণের বিরুদ্ধাচরণ করতেন না। অবশ্য এ যুগে গবেষণা একবারে বন্ধ হয়েছিল তা নয়। বরং এ যুগে মুজতাহিদ মুকা্ইয়্যাদ (যিনি তাঁর ইমামের অনুসৃত মূলনীতির অনুকরণের গবেষণা করেছেন) পাওয়া যেত। এ যুগের আলিমগণের প্রত্যেকে স্ব স্ব মাযহাবের প্রচারে কাজ করেন।

তাকলীদ হল, কোন নির্দিষ্ট ইমামের উদ্ভাবিত মাসআলা ও বিধানগুলোর জ্ঞান লাভ করা এবং সে গুলোকে শরীআত প্রণেতার প্রদর্শিত বিধান হিসেবে মেনে নেওয়া। আর সেগুলোর অনুসরণকে অত্যাবশ্যকীয় করে নেওয়া।

নিখুঁত তাকলীদের যুগ

তাকলীদের যুগ বলতে সপ্তম শতকের মধ্যভাগ হতে বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত সময়কে বুঝানো হয়েছে। পূর্বের যুগ থেকে এযুগে তাকলীদ বা অনুকরণ অধিকভাবে প্রসার লাভ করে। পূর্ববর্তী যুগগুলোতে ইজতিহাদ বা গবেষণার ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। এযুগে তার পরিসমাপ্তি ঘটে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগে সাহাবীগণ ও তাবিঈগণ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মাসাআলা ও আহকাম সম্পর্কে ইজতিহাদ করতে গিয়ে তাঁদের সর্বশক্তি ব্যয় করতেন এবং তাঁদের অনুসৃত নীতির উপর ভিত্তি করে পরবর্তীরা ইজতিহাদ করতেন।

তারপর আসে চতুর্থ যুগ। এ যুগে ইজতিহাদ ও গবেষণা উন্নতির শীর্ষ শিখরে পৌঁছে। কিন্তু পঞ্চম যুগে ইজতিহাদের ধারা কমে যেতে থাকে। অবশ্য এ যুগেও মুজতাহিদ মুকাইয়্যাদ পাওয়া যেত। তারা তাদের ইমামগণের মূলনীতি অনুসরণে ইজতিহাদ করতেন এবং ইজতিহাদের ক্ষেত্রে তারা প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে গেছেন। তারপর আসে ষষ্ঠ যুগ। এ যুগকে নিখুঁত তাকলীদের যুগ বলা যেতে পারে। এ যুগকে আমরা দুটি স্তরে ভাগ করতে পারি।

প্রথম স্তর : সপ্তম শতক থেকে শুরু করে দশম শতকের শুরুতে এ যুগ শেষ হয়। এ যুগে কতিপয় মণীষীর আবির্ভাব ঘটে যারা হলেন শাইখ খলীল মালিকী, কামাল ইবন হুমাম হানাফী,

সুবকী, সুয়ুতী ও রামলী-শাফিঈ যাদের ফিক্হ শাস্ত্রে অসাধারণ দখল ছিল। কিন্তু এতেঠদসত্ত্বেও তারা তাদের পূর্বসূরী ইমামদের মতো ইজতিহাদ না করে স্ব স্ব ইমামদের কিতাবসমূহের ব্যাখ্যা আবার কখনো তার সংক্ষেপণে ব্রত থাকেন।

দ্বিতীয় স্তর : হিজরী দশম শতক থেকে এ যুগ অদ্যাবধি চলে আসছে। এ যুগে নতুন মাসআলা উদ্ভাবন ও গবেষণার ধারা অনেকটা বন্ধ হয়ে যায়। এ যুগে গবেষণা প্রায় বিলুপ্ত হতে বসে। চিন্তাধারার স্বাধীনতা খতম হয়ে যায়। মাসআলা পর্যালোচনা ও উদ্ভাবনের ধারা রুদ্ধ হয়ে যায়। তর্ক-যুক্তির ও প্রায় অবসান ঘটে। স্ব-স্ব মাযহাবের পূর্ববর্তী ইমামগণের অভিমতের উপর সর্বসাধারণ ও আলিমগণের সকলেই অটল থাকেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তারা পূর্ববর্তী ইমামগণের রায়ের উপর নির্ভর করেন।

মোটকথা, এযুগেও ফিক্হ শাস্ত্রে আলিমগণের নতুন কোন আবিষ্কার ছিল না। তারা নিপুণতার সাথে শুধু তাদের ইমামদগণের অনুসরণই করে যাচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে মুসলমান, বিশেষ করে আলিম সমাজের উচিত ফিক্হ ও ইজতিহাদের ময়দানে নব জাগরণ সৃষ্টি করা। অবশ্য এ জন্য তাদের ইজতিহাদের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। আর যাদের ইজতিহাদের যোগ্যতা নেই তাদের স্ব স্ব মাযহাবের অনুসরণ করতে হবে।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

► সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. ইসলাম প্রথমতো:-
   ক. শান্তির ব্যবস্থা করে;
   খ. আকীদা-বিশ্বাস সংশোধন করে;
   গ. জেহাদের দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়;
   ঘ. আল্লাহর পথে দান করার জন্য উৎসাহ প্রদান করে।

২. নবুওয়াত প্রাপ্তির পর মক্কী-জীবনে রাসূল-
   ক. ১৩ বছর যাবৎ মানুষকে আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত দেন;
   খ. ১৩ বছর যাবৎ অপেক্ষা করেন;
   গ. ২৩ বছর জিহাদ ও সংগ্রাম করেন;
   ঘ. ৪০ বছর যাবৎ অত্যাচার সহ্য করেন।

৩. ফকীহগণ শরীআতের বিধানাবলি প্রণয়ন করতেন-
   ক. একক মূলনীতির ভিত্তিতে;
   খ. স্ব স্ব নীতির ভিত্তিতে;
   গ. শুধু কিয়াসের ভিত্তিতে;
   ঘ. কোন নীতিমালা ছাড়াই।

৪. গবেষক ইমাম (আইম্মায়ে মুজতাহিদীন) -এর যুগ বলতে বুঝায়-
   ক. হিজরী দ্বিতীয় শতককে;
   খ. হিজরী দ্বিতীয় শতক থেকে হিজরী চতুর্থ শতক পর্যন্ত সময়কে;
   গ. উমাইয়া যুগকে;
   ঘ. আব্বাসীয় যুগকে।

৫. ইমাম আযম কার উপাধি ছিল?
   ক. ইমাম শাফিঈর;
   খ. ইমাম আহমাদের;
   গ. ইমাম মালিকের;
   ঘ. ইমাম আবু হানীফার।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. রাসূলের (স) যুগের ফিক্‌হ শাস্ত্র সম্পর্কে লিখুন।
২. খুলাফায়ে রাশিদীন-এর যুগের ফিক্‌হ শাস্ত্র সম্পর্কে বর্ণনা করুন।
৩. তাবিঈদের যুগের ফিক্‌হ শাস্ত্র সম্পর্কে বর্ণনা দিন।
৪. গবেষক ইমামদের যুগের ফিক্‌হ শাস্ত্র সম্পর্কে লিখুন।
৫. গবেষণার পূর্ণতা ও তাকলীদের যুগ সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৬. নিখুঁত তাকলীদের যুগ সম্পর্কে লিখুন।
৭. নিখুঁত তাকলীদ বলতে কী বুঝানো হয়েছে? লিখুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. ফিক্‌হ শাস্ত্রের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২. ফিক্‌হ শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

পাঠ-৪

ইসলামী আইনের উৎসসমূহ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- ইসলামী আইনের উৎস সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- প্রথম উৎস হিসেবে আল-কুরআন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- দ্বিতীয় উৎস হিসেবে সুন্নাহ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- তৃতীয় উৎস হিসেবে ইজমা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন;
- চতুর্থ উৎস হিসেবে কিয়াস সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

ইসলামী আইনের উৎস

শরীআতের বিভিন্ন বিধান রচনার ক্ষেত্রে সে সব ভিত্তির উপর নির্ভর করা হয় এবং যেগুলোর আলোকে বিধান প্রণয়ন করা হয় সেগুলোকে ইসলামী আইন বা ফিকহ্-এর মূল উৎস বলে। ইসলামী আইনের মূল উৎস মোট চারটি।

শরীআতের বিভিন্ন বিধান রচনার ক্ষেত্রে সে সব ভিত্তির উপর নির্ভর করা হয় এবং যেগুলোর আলোকে বিধান প্রণয়ন করা হয় সেগুলোকে ইসলামী আইন বা ফিক্হ-এর মূল উৎস বলে। ইসলামী আইনের মূল উৎস মোট চারটি-

১. আল্লাহর কিতাব বা আল-কুরআন
২. রাসূলের সুন্নাহ বা আল-হাদীস
৩. ইজমা বা গবেষকদের ঐকমত্যে ভিত্তিক অভিমতো
৪. কিয়াস।

কিতাবুল্লাহ বা আল-কুরআন

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ইসলামী শরীআতের প্রথম উৎস, যা মহান আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মদ (স)-এর উপর অবতীর্ণ করেছেন। রাসূলের (স) নবুওয়াত প্রাপ্তির পর থেকে সুদীর্ঘ ২৩ বছর যাবৎ উদ্ভূত পরিস্থিতির সমাধান ও সময়ের চাহিদানুপাতে খণ্ড খণ্ড ভাবে কুরআন অবতীর্ণ হয়। তৎকালে মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস ও নৈতিক চরিত্রের চরম অবক্ষয় নেমে এসেছিল। তাই কুরআন অবতরণের সূচনা লগ্নে আকীদা-বিশ্বাস, উপদেশ এবং চরিত্র সংশোধন সংক্রান্ত সূরাগুলো অবতীর্ণ হয়। পরবর্তী পর্যায় বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে আহকাম বা বিধানাবলি সম্বলিত সূরাগুলো অবতীর্ণ হয়। কুরআনের আয়াতগুলো কখনো সাধারণভাবে অবতীর্ণ হয়। আবার কখনো বিশেষ কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়। রাসূল (স) কুরআনের আহকাম বা বিধানাবলি অনুযায়ী আমল করতেন, সাহাবাগণকে আমল করার নির্দেশ দিতেন এবং তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতেন। আবার কুরআনের আলোকে মানুষের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরও প্রদান করতেন। তাদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দিতেন।

আল-কুরআন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এর মধ্যে মানব জীবনের ইহ-পরকালের সব কিছুর বিবরণ রয়েছে। আল-কুরআন সর্বযুগ ও সর্বস্তরের মানুষের জন্য হিদায়াত স্বরূপ।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এর মধ্যে মানব জীবনের ইহ-পরকালের সব কিছুর বিবরণ রয়েছে। আল্লাহ বলেন-

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ

"আমি তোমার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যার মধ্যে সব কিছুর বর্ণনা রয়েছে।" (সূরা আন্-নাহল : ৮৯) অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন:

مَّا فَرَّطْنَا فِى ٱلْكِتَابِ مِن شَيْءٍ

"আমি কুরআনের মধ্যে কিছুই ছেড়ে দেইনি।" (সূরা আল-আনআম : ৩৮)

অতএব মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বযুগ ও সর্বস্তরের মানুষের জন্য হিদায়াত স্বরূপ। কুরআনকে যে অস্বীকার করবে সে কাফির হয়ে যাবে। কুরআনের সকল আয়াত কাতয়ী সমপর্যায়ের। কিন্তু একই শব্দের

যদি একাধিক অর্থ থাকে তখন তা অর্থের দিক থেকে পূর্বের মতো অকাট্য হবে না। তাতে ফকীহ ও মুজতাহিদগণের গবেষণা করার অবকাশ রয়েছে। এটা সর্বজনবিদিত যে, মহানবী (স) কুরআন সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বেশি জ্ঞানী ছিলেন। এরপর তাঁর সাহাবীবৃন্দ, যারা তাঁর থেকে কুরআনের তাফসীর এবং এর আয়াতসমূহ হতে আহকাম বা বিধানবলি উদঘাটনে যোগ্যতা অর্জন করেছেন।

কুরআনের আহকাম (বিধানাবলি) সম্পর্কিত আয়াত রয়েছে সর্বমোট পাঁচশত। অবশিষ্ট আয়াতগুলোতে সৎ উপদেশাবলি, ইতিহাস, বেহেশতের নিয়ামতো ও দোযখের আযাব ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে। তবে সেগুলোতেও পরোক্ষভাবে ইসলামী আইন-কানুনের ইঙ্গিত রয়েছে। কুরআনের বিধি-বিধানগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

কুরআনের আহকাম (বিধানাবলি) সম্পর্কিত আয়াত রয়েছে সর্বমোট পাঁচশত। অবশিষ্ট আয়াতগুলোতে সৎ উপদেশাবলি, ইতিহাস, বেহেশতের নিয়ামত ও দোযখের আযাব ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে।

আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট বিধান। এটি আবার দুই প্রকার

ক. এমন বিধান যা বান্দা ও তার প্রভুর মধ্যে সীমাবদ্ধ। যেমন : নামায, রোজা, হজ্জ ইত্যাদি বিষয়ক নির্দিষ্ট ইবাদত।

খ. এমন বিধান যা বান্দা ও তাঁর প্রভুর সাথে সংশ্লিষ্ট হলেও অন্য দিক থেকে তা বান্দার সাথেও জড়িত রয়েছে। যেমন : যাকাত, সাদকাহ, জিহাদ ইত্যাদি।

বান্দার সাথে সংশ্লিষ্ট বিধান। এটি আবার তিন প্রকার

ক. পারিবারিক বিধান, যেমন : বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার আইন ইত্যাদি।

খ. সামাজিক বিধান, যেমন : ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা, হিবা (দান), শোফা ইত্যাদি।

গ. প্রশাসনিক বিধান, যেমন : দণ্ডবিধি, রাষ্ট্রনীতি, রাষ্ট্রসংক্রান্ত বিধান ইত্যাদি।

রাসূলের সুন্নাহ বা আল-হাদীস

সুন্নাহ তথা রাসূলের (স) হাদীস ফিক্‌হ শাস্ত্রের দ্বিতীয় উৎস। কুরআনের আয়াত ক্ষেত্র বিশেষে সংক্ষিপ্তভাবে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু ঐ আয়াত হতে শরীআতের আহকাম ইত্যাদি হাদীসের ব্যাখ্যার আলোকেই প্রণয়ন করা হয়েছে। মহান আল্লাহ মানুষের উপর রাসূলের অনুসরণ আবশ্যক করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে-

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟

"রাসূল তোমাদের যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাক।" (সূরা আল-হাশর : ৭)

রাসূলের হাদীস দ্বারা কখনো এমন আহকাম প্রণীত হয়েছে যার প্রকাশ্য ইঙ্গিত কুরআনে পাওয়া যায় না। যদিও কুরআন সকল বিষয়ের মূল উৎস। অতএব সুন্নাহ হল ইসলামী শরীআত ও ফিক্‌হ শাস্ত্রের দ্বিতীয় উৎস। মহান আল্লাহ বলেন:

فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ

"কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতোভেদ ঘটলে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ ও রাসূলের নিকট, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস কর।" (সূরা আন-নিসা : ৫৯)

আর আয়াতের ভাবার্থ এই যে, কুরআন যেমনভাবে ইসলামী শরীআতের মূল উৎস, অনুরূপভাবে হাদীসও শরীয়াতের দ্বিতীয় মূল উৎস।

ইজমা (ঐকমত্যে)

কুরআন ও সুন্নাহর পর ইজমা হল ফিক্‌হ শাস্ত্রের তৃতীয় উৎস। ইজমার অর্থ হচ্ছে রাসূলের (স) ইন্তিকালের পর শরীআতের কোন বিধানের উপর উম্মতে মুহাম্মদী মুজতাহিদগণের (গবেষক) ঐক্যমতো পোষণ করা। চাই এই ঐকমত্যে সাহাবীদের যুগে হোক অথবা পরবর্তী যুগে হোক। রাসূলের ইন্তিকালের পর মুসলমানদের সম্মুখে বহু ধরনের সমস্যার উদ্ভব হয়, যে সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহতে প্রকাশ্য কোন দলীল পাওয়া যায় নি। বাধ্য হয়ে মুজতাহিদগণ পরস্পর পরামর্শ করে ঐ সব সমস্যার

সমাধানের ব্যাপারে সিদ্ধান্তে উপনীত হন। ইজমা (ঐকমত্যে) ইসলামী শরীআতের উৎস হওয়া সম্পর্কে কুরআনে এরশাদ হচ্ছে :

وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا

"কারো নিকট সৎপথ প্রকাশিত হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ব্যতীত অন্যপথ অনুসরণ করে, তবে যে দিকে সে ফিরে যায় সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দেব এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব। আর তা কত মন্দ আবাস!" (সূরা আন-নিসা : ১১৫)

এখানে মুমিনদের রাস্তা দ্বারা ইজমাকে বুঝানো হয়েছে।

ইজমা ইসলামী শরীয়াতের দলীল হওয়া সম্পর্কে রাসূলের (স) বাণী :

لا تجتمع أمتى على الضلا لة .

"আমার উম্মত গোমরাহী বা পথভ্রষ্টতার উপর ঐকমত্যে পোষণ করবে না।"

উল্লেখ্য, অত্র হাদীসে উম্মত এর দ্বারা উম্মতের আলিম সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে।

কিয়াস

কোন বিষয়ের বিধানের ব্যাপারে কুরআনের আয়াত বা সহীহ হাদীস না পাওয়া গেলে এমনকি ঐ বিষয়ের বিধানের উপর ইজমা (ঐকমত্য) সংঘটিত না হলে তখন ঐ সমস্যার সমাধানের জন্য কিয়াস ও ইজতিহাদ আবশ্যক হয়ে পড়ে।

কিয়াস হল ফিক্হ শাস্ত্রের চতুর্থ উৎস। কোন বিষয়ের বিধানের ব্যাপারে কুরআনের আয়াত বা সহীহ হাদীস না পাওয়া গেলে এমনকি ঐ বিষয়ের বিধানের উপর ইজমা (ঐকমত্যে) সংঘটিত না হলে তখন ঐ সমস্যার সমাধানের জন্য কিয়াস ও ইজতিহাদ আবশ্যক হয়ে পড়ে। কিয়াস এর গ্রহণযোগ্যতা ও বৈধতা সম্পর্কে কুরআন সুন্নাহ ও সাহাবীগণের উক্তি ও আমল হতে দলীল নিম্নে প্রদত্ত হল :

১. আল্লাহর বাণী

فَٱعْتَبِرُوا۟ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَبْصَٰرِ

"হে জ্ঞানীগণ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।" (সূরা আল-হাশর : ২)

অত্র আয়াতে একদল লোকের (ইয়াহূদীদের) যে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে, তা থেকে আমাদেরকে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ আমরা যদি তাদের মতো গর্হিত কাজ করি তবে তাদের মতো আমাদেরও শাস্তি ভোগ করতে হবে। এখানে পূর্বের ঘটনার উপর ভিত্তি করে মতোমতো দেওয়া হয়েছে।

২. আল-হাদীস : হযরত মুয়ায (রা)-কে রাসূল (স) যখন ইয়ামানে কাযী বা বিচারক করে পাঠালেন, তখন তাকে বললেন, তুমি কিসের দ্বারা ফাতওয়া দিবে বা ফয়সালা করবে? তদুত্তরে তিনি বললেন, কুরআন দ্বারা ফয়সালা করব। রাসূল (স) বললেন, যদি কুরআনে না পাও তবে কি করবে? তদুত্তরে তিনি বললেন, হাদীস দ্বারা ফয়সালা করব। রাসূল (স) বললেন, হাদীসে সামাধান না পেলে কি করবে? উত্তরে তিনি বললেন, আমার নিজস্ব কিয়াস ও যুক্তি দ্বারা ফয়সালা দেব। রাসূল (স) তখন খুশী হয়ে বললেন :

الحمد لله الذى وفق رسول الله بما ير ضى به رسول الله

"মহান আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা, যিনি তাঁর রাসূলের দূতকে এমন যোগ্যতা দিয়েছেন, যাতে তাঁর রাসূল খুশী হন।"

৩. সাহাবীগণের উক্তি ও আমল হতে কিয়াস-এর বৈধতার দলীল : মুসলমানগণ রাসূলের (স) ইন্তিকালের পূর্বে আবু বকরের (রা) নামাযের ইমামতৌীর উপর কিয়াস করে তাঁকে রাসূলের (স) প্রতিনিধি হিসেবে উত্তম ব্যক্তি মনে করে ছিলেন। অনুরূপভাবে আবু বকর (রা) নামায তরককারীদের উপর কিয়াস করে যাকাতদানে অসম্মতি জ্ঞাপনকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। অর্থাৎ আবু বকর (রা) যাকাতকে নামাযের সাথে তুলনা করেছিলেন। সুতরাং নামায অস্বীকার করলে মানুষ যেভাবে কাফির হবে, অনুরূপভাবে যাকাতদানে অস্বীকার করলেও কাফির হবে। আবু

বকরের (রা) এ কিয়াস সাহাবীগণ মেনে নিয়েছিলেন এবং তাঁরা যাকাতদানে অসম্মতি জ্ঞাপনকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

► সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. কুরআন কীভাবে অবতীর্ণ হয়?
   ক. সম্পূর্ণ কুরআন এক সঙ্গেই অবতীর্ণ হয়:
   খ. ১৩ বছর যাবৎ খণ্ড খণ্ড আকারে অবতীর্ণ হয়;
   গ. ৩০ খন্ডে অবতীর্ণ হয়;
   ঘ. ২৩ বছর যাবৎ চাহিদা অনুযায়ী খণ্ড খণ্ড আকারে অবতীর্ণ হয়।

২. কুরআনে বিধান সম্পর্কিত আয়াতের সংখ্যা
   ক. প্রায় পাঁচশত; খ. পাঁচশত;
   গ. অনির্দিষ্ট সংখ্যক; ঘ. পাঁচ হাজার।

৩. ফিক্‌হ শাস্ত্রের মুল উৎস হচ্ছে-
   ক. কুরআন, হাদীস, দেশের সংবিধান ও কিয়াস;
   খ. কুরআন, সুন্নাহ, ঐকমত্যে;
   গ. কিতাব, সুন্নাহ, জনসাধারণের ঐকমত্যে ও কিয়াস;
   ঘ. কিতাবুল্লাহ, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস।

৪. ইজমা বলতে বুঝায়-
   ক. সাধারণ জনগণের ঐকমত্যে; খ. উম্মতের ঐকমত্যে;
   গ. কুরআন-হাদীসের উপর ঐকমত্যে; ঘ. বিজ্ঞানীদের ঐকমত্যে।

৫. কুরআনের বিধিবিধানগুলো-
   ক. দুইভাগে বিভাক্ত; খ. তিন ভাগে বিভক্ত;
   গ. পাঁচ ভাগে বিভক্ত; ঘ. দশ ভাগে বিভক্ত।

৬. রাসূলের অনুসরণ করা আবশ্যক কেন?
   ক. আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে; খ. উম্মতের ঐকমত্যের কারণে;
   গ. কিয়াসের দাবি অনুসারে; ঘ. রাসূলের নির্দেশক্রমে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ফিক্‌হ শাস্ত্রের মূল উৎস হিসেবে কুরআনের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
২. ফিক্‌হ শাস্ত্রের দ্বিতীয় মূল উৎস হিসেবে সুন্নাহ-এর গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
৩. ফিক্‌হ শাস্ত্রের তৃতীয় মূল উৎস ইজমা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
৪. কিয়াস কী? ইসলামী শরীআতের চতুর্থ মূল উৎস হিসেবে কিয়াস সম্পর্কে নিখুন।
৫. কুরআনের বিধানগুলো কয়ভাগে বিভক্ত? বর্ণনা করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. ফিক্‌হ শাস্ত্রের উৎস কয়টি ও কী কী? বিস্তারিত আলোচনা করুন।

পাঠ-৫

ইজতিহাদ ও এর প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- ইজতিহাদ-এর সংজ্ঞা দিতে পারবেন;
- ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- ইজতিহাদের বৈধতার দলীল ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ইজতিহাদের শর্তাবলি বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- ইজতিহাদের শ্রেণীবিভাগ করতে পারবেন।

ইজতিহাদ-এর অর্থ

আভিধানিক অর্থ

আল-ইজতিহাদ (الاجتهاد) শব্দটি জুহদুন (جهد) হতে গৃহীত, যার মানে হল প্রচেষ্টা। ইজতিহাদের মানে হল, কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য চেষ্টা ও চিন্তা শক্তিকে ব্যয় করা। এ চেষ্টা কোন কঠিন কাজ বা অসাধ্যকে সাধন করার নিমিত্তে হতে পারে। ঐ কাজ শারীরিক হোক যেমন : কোন বড় পাথর উঠাবার জন্য চেষ্টা করা। অথবা মেধাভিত্তিক হোক, যেমন : কোন হুকুম বা বিধান উদঘাটিনের জন্য চেষ্টা করা।

পারিভাষিক অর্থ

শরীআতের পরিভাষায় ইজতিহাদ-এর সংজ্ঞা নিয়ে মণীষীদের মধ্যে মতোপার্থক্য রয়েছে যা নিম্নরূপ:

ক. ইমাম বায়যাবী (র) বলেন, 'ইজতিহাদের মানে হল, শরীআতের বিধানাবলি জানার জন্য চেষ্টা ও শক্তি ব্যয় করা।'

খ. ইমাম গাযালীর মতে, 'ইজতিহাদ মানে শরীআতের বিধান উদঘাটন করার জন্য ইলম (জ্ঞান) সন্ধান করতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করা।'

গ. আল্লামা আলাউদ্দীন (র) বলেন, শরীআতের বিধিবিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য চেষ্টা করাকে ইজতিহাদ বলে।'

ঘ. ইবনে হাজিব বলেন, 'ইজতিহাদ অর্থ শরীআতের কোন বিধান প্রণয়নের জন্য ফকীহ ব্যক্তির চেষ্টাপূর্বক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া।

ইজতিহাদের প্রয়োজনীতা

যদি সকল দলীল অকাট্য হতো তাহলে আমরা উদ্ভূত বিভিন্ন প্রকার মাসআলার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত ও মতামত দিতে পারতাম না। কিন্তু শরীআতের কতিপয় দলীল জন্নী হওয়ার ফলে ইজতিহাদের দ্বারা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়ে উঠে।

ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো অকাট্য দলীল-প্রমাণ (যাতে সন্দেহের অবকাশ নেই) দ্বারা প্রমাণিত। পক্ষান্তরে মুআমালাত সম্পর্কিত মাসআলাগুলো জন্নী দলীল (যার বিভিন্ন রকম মানে হতে পারে) দ্বারা প্রমাণিত আর তাতে ইজতিহাদের অবকাশ রয়েছে। এটা উম্মাতে মুহাম্মদীর জন্য রহমতো স্বরূপ।

সুতরাং বলা যায়, ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোতে ইজতিহাদের অবকাশ নেই। তবে শাখা প্রশাখারয় ইজতিহাদের অবকাশ রয়েছে।

কারণ-

১. সব দলীলই যদি অকাট্য হতো তবে মানুষের চিন্তা শক্তির মূল্যায়ন করা হতো না।

২. এছাড়া শরীআতের শাখা-প্রশাখাগুলোতেও সকলকে একই হুকুম মানতে হতো, যা মানুষের জন্য কষ্টসাধ্য হতো। সুতরাং শরীআতের মৌলিক বিষয়গুলো ছাড়া শাখা প্রশাখাগুলোতে মণীষীদের মধ্যে ইখতিলাফ (মতোবিরোধ) থাকা মানুষের জন্য কল্যাণস্বরূপ।

৩. যদি সকল দলীল অকাট্য হতো তাহলে আমরা উদ্ভূত বিভিন্ন প্রকার মাসআলার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত ও মতোমতো দিতে পারতাম না। কারণ সকল দলীল অকাট্য হওয়ার কারণে মুজতাহিদগণ

ইজতিহাদ করতে পারতেন না। কিন্তু শরীআতের কতিপয় দলীল জন্মী হওয়ার ফলে ইজতিহাদের দ্বারা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়ে উঠে।

ইজতিহাদের বৈধতার দলীল

ইসলামী শরীআতের ইজতিহাদের গুরুত্ব অত্যধিক। ইজতিহাদ শরীআতসম্মত বা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে বহু দলীল পাওয়া যায়।

কুরআনে ইজতিহাদের প্রমাণ

পবিত্র কুরআনের বহু জায়গায় মহান আল্লাহ চিন্তা (فكر) ও অনুধাবন (عقل) এর প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।

১. আল্লাহ বলেন :

إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"অবশ্যই এর মধ্যে রয়েছে জ্ঞানী ও চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন।" (সূরা আর-রাদ: ৩)

২. অন্যত্র আল্লাহ বলেন :

وَيَتَفَكَّرُونَ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ

"তারা আসমান ও যমীন সৃষ্টির ব্যাপারে চিন্তা করে।" (সূরা আলে-ইমরান : ১৯১)

৩. আল্লাহ বলেন :

كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

"এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নির্দেশ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা তা বুঝতে পার।" (সূরা আন-নুর : ৬১)

অনুরূপভাবে কিয়াস দ্বারা সরাসরি ইজতিহাদের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে :

إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَاكَ ٱللَّهُ

"আমি তোমার উপর সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি আল্লাহ তোমাকে যা জানিয়েছেন, সে আলোকে বিচার-মীমাংসা কর।" (সূরা আন-নিসা : ১০৫)

হাদীসে ইজতিহাদের প্রমাণ

হাদীসেও ইজতিহাদের বৈধতা সম্পর্কে প্রকাশ্য দলীল রয়েছে। ইমাম শাফিঈ (র) আমর ইবনুল আস (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলকে (স) বলতে শুনেছেন।

اذا حكم الحاكم فا جتهد فأصاب فله أجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطا فله اجر

"বিচারক যখন বিচার-ফয়সালা করতে গিয়ে ইজতিহাদ করেন এবং তাতে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তবে তিনি দুটি সওয়াব পাবেন। আর যদি তিনি ভুল সিদ্ধান্ত উপনীত হন, তবে তিনি একটি সওয়াব পাবেন।"

এ বিষয়ে মুয়ায (রা)-এর হাদীসটিও সকলের জানা আছে। তা হচ্ছে, রাসূল (স) তাঁকে ইয়ামানে কাযী (বিচারক) হিসেবে পাঠাবার সময় বললেন, তুমি কিসের দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ের ফয়সালা দেবে? মুয়ায বললেন, আল্লাহর কিতাব দ্বারা ফয়সালা করব। রাসূল (স) বললেন, যদি কুরআনে ঐ বিষয়ে ফয়সালা না পাও, তবে কি করবে? মুয়ায বললেন, হাদীসের দ্বারা রায় দিব। রাসূল (স) বললেন, হাদীসে ঐ বিষয়ে প্রকাশ্য কিছু না পেলে কি করবে? তদুত্তরে তিনি বললেন, আমি আমার রায় ও চিন্তা দ্বারা ইজতিহাদ করব এবং আমি পিছু হটব না।" রাসূল (স) বললেন : "মহান আল্লাহর শোক্‌র যিনি তার রাসূলের দূতকে এমন কিছুর তৌফিক দিয়েছেন, যাতে তাঁর রাসূল সন্তুষ্ট হন।"

ইজতিহাদের শর্ত

ইতঃপূর্বে আমরা অবগত হয়েছি মুজতাহিদ এমন বিষয়ে ইজতিহাদ করবেন, যে সম্পর্কে কোন অকাট্য দলীল নেই। আর যে বিষয় বা মাসআলার উপর ইজমা (ঐকমত্যে) রয়েছে তাতেও ইজতিহাদের অবকাশ নেই। কারণ উম্মাতের ইজমাও কাতয়ী (অকাট্য) দলীলের সমপর্যায়ভুক্ত। ইজতিহাদের বেলায় মুজতাহিদের মধ্যে যে শর্তগুলো থাকা প্রয়োজন তা নিম্নরূপ:

ইতঃপূর্বে আমরা অবগত হয়েছি মুজতাহিদ এমন বিষয়ে ইজতিহাদ করবেন, যে সম্পর্কে কোন অকাট্য দলীল নেই। আর যে বিষয় বা মাসআলার উপর ইজমা (ঐকমত্য) রয়েছে তাতেও ইজতিহাদের অবকাশ নেই।

১. মুজতাহিদ বালিগ ও প্রয়োজনীয় জ্ঞান সম্পন্ন হবেন। কারণ অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও জ্ঞানহীন ব্যক্তি তার নিজের মঙ্গল সাধনে অপারগ। তিনি কিভাবে অন্যদের মঙ্গলের জন্য ইজতিহাদ করবেন।

২. মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের আয়াতুল আহকাম (বিধানাবলির আয়াত) সম্পর্কে মুজতাহিদের পূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে, যাতে তিনি ঐ আয়াতগুলোর উপর ভিত্তি করে ইজতিহাদ করতে পারেন। কুরআনে বর্ণিত আহকাম সম্পর্কিত আয়াতের সংখ্যা হল পাঁচশত।

৩. আহাদীসুল আহকাম বা বিধান সম্পর্কিত হাদীসের জ্ঞান থাকতে হবে, যাতে প্রয়োজন বোধে মুজতাহিদ ব্যক্তি ঐ হাদীসসমূহের উপর ভিত্তি করে তার ইজতিহাদ কর্ম সম্পন্ন করতে পারেন। আহাদীসুল আহকামের সংখ্যা তিন হাজার মাত্র।

৪. আরবী ভাষার জ্ঞান থাকতে হবে। কেননা ইসলামী শরীআতের মূল হল কুরআন ও সুন্নাহ। আরবী ভাষায় ব্যুৎপত্তি না থাকলে কুরআন ও সুন্নাহ হতে গবেষণা কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

৫. যে সব মাসআলার উপর ইজমা হয়েছে, সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে, যাতে তার কিয়াস তথা ইজতিহাদ এবং ইজমা পরস্পর বিপরীত না হয়।

৬. কিয়াস সম্পর্কিত জ্ঞান থাকা। কিয়াসের শর্ত এবং কিয়াসের সাহায্যে কিভাবে মাসআলা গবেষণা করা হয়, সে সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে। কিয়াসই হল ইজতিহাদের মূল। যার কিয়াস সম্পর্কে ধারণা নেই, সে গবেষণা করতে পারবে না।

৭. উসূলে ফিক্হ-এর মূলনীতির এর জ্ঞান থাকা। মুজতাহিদের কাছে উসূলে ফিক্হ এর জ্ঞান থাকতে হবে। কেনানা উসূলে ফিক্হ হল ইজতিহাদের মূল স্তম্ভ। অবশ্য মুজতাহিদে মুতলাকের জন্য উসূলে ফিক্হর জ্ঞান থাকতে হবে। কিন্তু মুজতাহেদে মুকাইয়্যাদের জন্য উসূলে ফিক্হর পূর্ণ জ্ঞান থাকা শর্ত নয়। তাকে তার ইমামের উসূল বা মূলনীতি জানলেই চলবে (মুতলাক ও মুকাইয়্যাদের ব্যাখ্যা পরে আসছে)।

৮. আহকাম (বিধান) প্রণয়নে শরীআতের উদ্দেশ্য জানতে হবে। অর্থাৎ কোন বিষয়ে আহকামের ব্যাপারে শরীআতের সাধারণ উদ্দেশ্য বুঝতে হবে। যেমন- মানুষের মঙ্গল সাধন, দীনের হিফাজত এবং জান-মালের হিফাজত ইত্যাদি। কেননা শরীআতের নুসূস (কুরআনের আয়াত ও রাসূলের হাদীস) বুঝা ও উহার প্রতিফলন ঘটাতে হলে শরীআতের উল্লেখিত উদ্দেশ্যসমূহ জানতে হবে। সুতরাং মুজতাহিদকে ইজতিহাদ করতে হলে, ইজতিহাদের পূর্বে শরীআতের উদ্দেশ্য জানতে হবে। যেমনিভাবে হযরত উমর (রা) বুঝেছিলেন। যেমন- চোরের হাত কাটার উদ্দেশ্য মালের হিফাযত নিশ্চিত করা। কিন্তু কঠিন দুর্ভিক্ষের সময় তিনি চোরের হাত কাটতেন না। কেননা মালের হিফাযতের চেয়ে জানের হিফাযতের গুরুত্ব অত্যধিক।

৯. নাসিখ-মানসুখের (রহিতোকারী ও রহিতোকৃত বিধানের) জ্ঞান থাকা আবশ্যক। মুজতাহিদ ব্যক্তির নিকট কুরআন ও সুন্নাহর নাসিখ ও মানসুখের জ্ঞান থাকতে হবে অর্থাৎ যে সব আয়াত ও হাদীস রহিতো হয়েছে এবং যা দ্বারা রহিতো করা হয়েছে তার জ্ঞান থাকতে হবে। অন্যথায় মানসুখ আয়াত বা হাদীসের উপর ভিত্তি করে তিনি ইজতিহাদ করে বসতে পারেন। এ জন্য তাকে আয়াতুল আহকাম ও আহাদীসুল আহকামের মধ্যে নাসিখ মানসুখের সংক্ষিপ্ত জ্ঞান আবশ্যই থাকতে হবে।

মুজতাহিদের শ্রেণী বিভাগ

ইতঃপূর্বে আমরা বলেছি, মুজতাহিদ হলেন এমন ফকীহ ব্যক্তি, যিনি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে শরীআতের কোন বিধান প্রণয়নের জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করেন। যোগ্যতা হিসেবে তাদের দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

১. মুজতাহিদ মুতলাক : মুজতাহিদ মুতলাক বলতে এমন ফকীহকে বুঝায়, যিনি শরীয়াতের বিধানাবলি তার স্পষ্ট দলীল হতে নিজেই গবেষণা করতে পারেন। এতে তাকে কোন নির্দিষ্ট

ইমামের অনুসরণ করতে হয় না। এ পর্যায়ের মুজতাহিদগণের মধ্যে রয়েছেন, সাহাবী ও তাবিঈগণের মধ্যকার ফকিহগণ এবং চার মাযহাবের ইমামগণ। তদ্রূপ তাদের সমসাময়িক ফকীহগণ অথবা যারা তাদের পরে এসেছেন, কিন্তু তাদের মাযহাব সাধারণত অনুসরণ করা হয় না। যেমন: আওযায়ী, লাইছ ইবনে সায়া'দ, ইবনে জারীর তাবারী, দাউদ জাহেরীর ও সাওরী (র)।

মুজতাহিদ মুতলাক বলতে এমন ফকীহকে বুঝায়, যিনি শরীয়াতের বিধানাবলি তার স্পষ্ট দলীল হতে নিজেই গবেষণা করতে পারেন। এতে তাকে কোন নির্দিষ্ট ইমামের অনুসরণ করতে হয় না।

২. মুজতাহিদ মুকাইয়্যাদ : যে মুজতাহিদ তার ইমামের নীতিসমূহের অনুসরণে মাসআলা গবেষণা করেন তিনি হলেন মুজতাহেদ মুকাইয়্যাদ। তিনি স্বীকৃত চার মাযহাবের ইমামগণের সমপর্যায়ের নন। এদের মধ্যে হানাফী মাযহবে রয়েছেন ইমাম আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ ও যুফার (র)। মালিকী মাযহাবে রয়েছেন : ইবনুল কাশীম ও আশহাব। শাফিঈ মাযহাবে রয়েছেন, ইমাম সূয়ুতী ও মুযানী। আর হাম্বলী মাযহাবে রয়েছেন : সালেহ ইবনে আহমাদ ইবনে হাম্বল ও আবু বকর আল-খাল্লাল প্রমুখ।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. "ইজতিহাদ মানে হল, ইলম সন্ধান করতে গিয়ে শরীআতের বিধান উদঘাটন করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করা" এটি কার উক্তি?
   ক. ইমাম বায়যাবীর; খ. ইমাম আবু হানীফার;
   গ. ইমাম গাযালীর; ঘ. ইবনে হাজার আল-আসকালানীর।

২. ইজতিহাদ কখন করতে হয়?
   ক. কুরআন হাদীসে সমাধান পাওয়া গেলে; খ. ইতিহাসে দক্ষতা অর্জন করা হলে;
   গ. কুরআন-হাদীসে এবং ইজমায় সমাধান না পাওয়া গেলে;
   ঘ. ইসলামী জ্ঞানের পাণ্ডিত্য অর্জিত হলে।

৩. ইজতিহাদের শর্ত ক'টি?
   ক. ৯টি; খ. ২১টি;
   গ. ১২টি; ঘ. ৫টি।

৪. ইজতিহাদ করার জন্য-
   ক. আরবী ভাষা জানার দরকার নেই; খ. সকল ভাষা জানতে হবে;
   গ. আরবী ভাষা অবশ্যই জানতে হবে; ঘ. কুরআন-হাদীসের অনুবাদ জানলেই হবে।

৫. মুজতাহিদ মুতলাক হলো যিনি-
   ক. নিজের মূলনীতি অনুসারে গবেষণা করেন;
   খ. অন্য ইমামের মূলনীতি অনুসারে গবেষণা করেন;
   গ. উভয় মূলনীতি অনুসারে গবেষণা করেন;
   ঘ. শুধু কুরআন অনুসারে গবেষণা করেন।

সংক্ষিপ্ত রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. ইজতিহাদ এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ লিখুন।
২. ইজতিহাদ এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৩. ইজতিহাদের শর্তাবলি আলোচনা করুন।
৪. কুরআন ও সুন্নাহ হতে ইজতিহাদ এর বৈধতার দলীল পেশ করুন।
৫. মুজতাহিদের প্রকারসমূহ বর্ণনা করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. ইজতিহাদ কাকে বলে? এর প্রয়োজনীয়তা বিস্তারিতভাবে লিখুন।
২. ইজতিহাদের শর্তাবলি, বৈধতা ও মুজতাহিদের শ্রেণি বিভাগ বর্ণনা করুন।

পাঠ-৬

ইজতিহাদ ও এর ক্রমবিকাশ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- ইজতিহাদের উৎপত্তি সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ইজতিহাদের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- রাসূলুল্লাহ (স) ও সাহাবীদের ইজতিহাদের প্রমাণ দিতে পারবেন।

ইজতিহাদের পটভূমি ও ক্রমবিকাশ

কুরআন ও সুন্নাহ হতে এটা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর পক্ষ হতে রাসূল (স)-কে ইজতিহাদের অনুমতি দেওয়া হয়। অনুরূপভাবে তিনিও তাঁর সাহাবীদেরকে ইজতিহাদের অনুমতি দান করেন।

কুরআন ও সুন্নাহ হল ইসলামী শরীআতের মূল ভিত্তি। কুরআন ও সুন্নাহ হতে এটা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর পক্ষ হতে রাসূল (স)-কে ইজতিহাদের অনুমতি দেওয়া হয়। অনুরূপভাবে তিনিও তাঁর সাহাবীদেরকে ইজতিহাদের অনুমতি দান করেন। সাহাবীদের বহু ইজতিহাদ তিনি মেনে নিয়েছিলেন।

রাসূল (স)-এর ইজতিহাদ

রাসূল (স)-এর ইজতিহাদের দলীল হিসেবে নিম্নের ঘটনাবলির উল্লেখ করা যায়। তিনি বদর যুদ্ধের বন্দিদের সম্পর্কে সাহাবীদের নিয়ে পরামর্শ করেন। অতঃপর আবু বকরের (রা) পরামর্শ গ্রহণ করে নিজে ইজতিহাদের দ্বারা বন্দিদের মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেন। যদিও উমরের (রা) পরামর্শ ছিল এর বিপরীত। এ সম্পর্কে কুরআনে এরশাদ হচ্ছে :

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِى ٱلأَرْضِ

"দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দি রাখা কোন নবীর জন্য সংগত নয়।" (সূরা আল-আনফাল : ৬৭)

অত্র আয়াতে আল্লাহ তাঁর রাসূল (স)-কে বন্দিদের ছেড়ে দেওয়ায় হালকা ভর্ৎসনা করেন। তবে রাসূলের এ সিদ্ধান্তকে আল্লাহ বাতিল করে দেননি। অনুরূপভাবে তিনি তাবুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারীদের ব্যাপারে ইজতিহাদ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। ঐ যুদ্ধে যে সব মুনাফিক অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকার জন্য ওযর-আপত্তি পেশ করেছিল, তিনি তাদের ওযর-আপত্তি গ্রহণ করেছিলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ وَتَعْلَمَ ٱلْكَـٰذِبِينَ

"আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। কারা সত্যবাদী তা তোমার নিকট স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এবং কারা মিথ্যাবাদী তা জানা পর্যন্ত তুমি কেন তাদের অব্যাহতি দিলে?" (সূরা আত-তাওবা: ৪৩)

সাহাবীদের ইজতিহাদ

মহানবী (স) সাহাবীগণকেও ইজতিহাদের অনুমতি দিয়েছেন। সাহাবীদের ইজতিহাদের প্রমাণ স্বরূপ নিম্নের ঘটনাবলি উল্লেখ করা যায়।

মহানবী (স) যখন মুয়ায ইবনে জাবালকে (রা) ইয়ামেনে প্রেরণ করেন, তখন তিনি মুয়াযকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি সেখানে কীভাবে বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা করবে? মুয়ায বললেন, আল্লাহর কিতাব (কুরআন) দ্বারা ফয়সালা করব। রাসূল (স) বললেন, যদি কুরআনে ঐ বিষয়ে কোন ফয়সালা না পাও, তবে কী করবে? মুয়ায বললেন, হাদীস দ্বারা রায় দেব। রাসূল (স) বললেন, যদি হাদীসেও ঐ বিষয়ে প্রকাশ্য কিছু না পাওয়া যায় তখন কী করবে? তদুত্তরে তিনি বললেন, আমি আমার নিজস্ব চিন্তা ও রায় দ্বারা ইজতিহাদ করব এবং আমি পিছু হটব না। তখন রাসূল (স) বললেন : "মহান আল্লাহর শুকর, যিনি তাঁর রাসূলের দূতকে এমন তাওফিক দিয়েছেন, যাতে তাঁর রাসূল সন্তুষ্ট হন।"

অত্র হাদীসে রাসূল (স) তাঁর সাহাবীর কিয়াস ও ইজতিহাদের উপর নির্ভর করার বিষয় জানতে পেরে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। রাসূলের (স) উপস্থিতিতে ও অনুপস্থিতিতে সাহাবীদের ইজতিহাদের অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁদের ইজতিহাদ সঠিক হলে তিনি তাতে অনুমোদন দিতেন, ভুল হলে শুধরে দিতেন। নিম্নের ঘটনাগুলোতে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়।

১. বনু কুরাইযা গোত্রের ইয়াহূদীদের উপর মুসলমানগণ জয়যুক্ত হন এবং তাদের দূর্গ ঘিরে ফেলেন। তখন মুসলমানগণ সা'দ ইবন মুয়াজকে (রা) তাদের ব্যাপারে ফয়সালার জন্য বিচারক মনোনয়ন করেন। ইয়াহূদীরাও তার বিচার মেনে নিতে রাজী হয়। সা'দ (রা) তাদের পুরুষদের শিরোশ্ছেদ এবং মহিলা ও শিশুদের বন্দির নির্দেশ দেন। এ ফয়সালার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে রাসূল (স) বললেন : "সা'দ! তুমি তাদের ব্যাপারে আল্লাহর ফয়সালা অনুসারে ফয়সালা দিয়েছ।"

   সা'দ নিজ ইজতিহাদেই এর রায় দিয়েছিলেন। বনু কুরাইযার ইয়াহূদীদেরকে তিনি মুহারেবীনের (মুসলমানদের বিপক্ষের যোদ্ধা) সাথে কিয়াস বা তুলনা করেছিলেন।

   কুরআনে মুহারিবীদের শিরোশ্ছেদের নির্দেশ রয়েছে। কেনানা বনু কুরাইযার ইয়াহূদীরা মুসলমানদের সাথে তাদের সন্ধী ভঙ্গ করে খন্দক যুদ্ধে কুরাইশদের সহায়তা দিয়েছিলেন। তাই সা'দ তাদেরকেও মুসলমানদের বিপক্ষীয় যোদ্ধা হিসেবে গণ্য করেছিলেন। আবার কেউ বলেন, তিনি বনু কুরাইযাকে বদরের বন্দিদের সাথে কিয়াস (তুলনা) করেছিলেন। কারণ ঐ বন্দিদের হত্যো না করে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়ায় আল্লাহ তাঁর রাসূল (স)-কে র্ভৎসনা করেছিলেন তখন মুক্তিপণ নিয়ে বন্দিদের ছেড়ে দেওয়ার বিধান অবতীর্ণ হয়নি। পরবর্তীতে এ সম্পর্কে ওহী অবতীর্ণ হয় :

   فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً

   "অতঃপর হয় অনুকম্পা নয় মুক্তিপণ।" (সূরা মুহাম্মদ : ৪)

২. দু'জন সাহাবী একদা সফরে বের হলেন অথচ তাদের নিকট পানি ছিল না। এমতোাবস্থায় নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হলে তারা তায়াম্মুম করে নামায আদায় করেন। কিন্তু নামাযের ওয়াক্ত থাকাকলীন অবস্থায় তারা পানি পেয়ে যান। তখন তাদের একজন অযু করে দ্বিতীয়বার নামায পড়েন। আর অপরজন অযু করেননি এবং পুনরায় নামাযও পড়েননি। রাসূল (স) তাদের উভয়ের সিদ্ধান্তকেই সঠিক বলে অনুমোদন দিলেন। যিনি নামায দ্বিতীয়বার পড়েননি তাকে বললেন, তুমি সুন্নাত মোতাবেক কাজ করেছে, তোমার পূর্বের নামাযই যথেষ্ট হয়েছে। আর যিনি নামায পুনরায় পড়লেন তাকে বললেন, তুমি দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করলে।

৩. অনুরূপভাবে রাসূল (স) খন্দকযুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনের পর যুদ্ধের পোশাক খোলার ইচ্ছা করার সাথে সাথে আল্লাহ তাঁকে বনু কুরাইযার ইয়াহূদীদের নিকট যেতে বললেন, তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে বললেন :

   "তোমাদের কেউ বনু কুরাইযা গোত্রে পৌছার পূর্বে আছরের নামায পড়বে না। সাহাবীগণ দ্রুত গতিতে রওয়ানা হলেন। অবশ্য তাদের কেউ কেউ পথিমধ্যে নামাযের সময় উপস্থিত হওয়ায় পথেই নামায আদায় করলেন। তারা রাসূল (স)-এর বাণীর দ্বারা বুঝেছিলেন যে, তিনি দ্রুত যেতে বলেছেন। আবার কেউ কেউ পথিমধ্যে নামায না পড়ে ঠিক গন্তব্যস্থলে পৌছে নামায পড়লেন। উভয় দলের সাহাবীগণ রাসূল (স) নিকট নিজেদের ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি উভয় দলকেই সঠিক বলে অনুমোদন দিলেন। কাউকে ভুল বললেন না।

৪. অন্য এক ঘটনায় দেখা যায় যে, কতিপয় সাহাবী একদা ভ্রমণে বের হলেন। তাঁদের মধ্যে উমর (রা) ও মুয়ায (রা) ছিলেন। ভোর হলে উমর ও মুয়ায উভয়েরই গোসলের প্রয়োজন দেখা দিল। কিন্তু তাদের সাথে পানি ছিল না। অতঃপর দু'জনেই তাদের সাধ্যানুসারে ইজতিহাদ করলেন। তন্মধ্যে মুয়াজ মাটি দ্বারা পবিত্রতাকে পানি দ্বারা পবিত্রতার সাথে তুলনা করলেন এবং মাটিতে গড়াগড়ি দিলেন। কিন্তু উমর এটা করলেন না। তিনি নামাযের ওয়াক্ত শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। তাঁরা উভয়ে মদীনায় এসে রাসূলের (স) নিকট তাঁদের অবস্থা বর্ণনা করলেন। তিনি

এমতোবস্থায় সঠিক করণীয় সম্পর্কে শিক্ষা দিতে গিয়ে বললেন, মুয়াযের কিয়াস ভুল হয়েছে। কারণ তার কিয়াস কুরআনের আয়াতের বিপরীত। আল্লাহ বলেন :

فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ

"তায়াম্মুমকালে তোমরা মাটি দ্বারা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাসেহ কর।" (সূরা আল- মায়েদা : ৬) আর মুয়াযকে বললেন, তায়াম্মুম করাই তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল। অপর পক্ষে উমরকে বললেন, তায়াম্মুম দ্বারা যেভাবে হাদাসে আছগার (ছোট নাপাকী) হতে পবিত্র হওয়া যায়, তদ্রূপ হাদাসে আকবার (বড় নাপাকী, যাতে গোসল ওয়াজিব হয়) থেকেও পাক হওয়া যায়।

রাসূল (স)-এর ইন্তিকালের পর ইসলামী সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। ফলে নিত্য নতুন সমস্যার উদ্ভব হতে থাকে। যার সমাধানের জন্য সাহাবীগণ ইজতিহাদের প্রতি আরো তৎপর হয়ে উঠেন।

রাসূল (স)-এর ইন্তিকালের পর ইসলামী সাম্রাজ্যের অধিক বিস্তৃতি ঘটে। ফলে নিত্য নতুন সমস্যার উদ্ভব হতে থাকে। যার সমাধানের জন্য সাহাবীগণ ইজতিহাদের প্রতি আরো তৎপর হলেন। তাদের মধ্যে আলিম ও ফকীহগণ ইজতিহাদ দ্বারা বিভিন্ন সমস্যার সমাধানকল্পে ফাতওয়া প্রদান করতেন।

তাবিঈ, তাবি-তাবিঈ ও ইমামদের ইজতিহাদ

সাহাবীগণের পর তাবিঈগণের যুগে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ফাতওয়ার প্রয়োজনীয়তা আরো বেড়ে যায়। অতঃপর তাবিঈগণের যুগে এর সর্বাধিক গুরুত্ব অনুভূত হয়।

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে ৪র্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত ইজতিহাদ

এরপর মাযহাবী ইমামগণের যুগে হিজরী দ্বিতীয় শতকের শুরু হতে চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ইজতিহাদের স্বর্ণযুগ ছিল। পাঁচটি প্রসিদ্ধ শহরের পাঁচজন ইমাম ইজতিহাদে খ্যাতি লাভ করেন। মদীনায় ইমাম মালিক, মক্কায় ইমাম শাফিঈ, ইরাকে ইমাম আবু হানীফা, সিরিয়ায় ইমাম আওযায়ী এবং মিশরে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও দাউদ জাহিরী। এ সব ইমামগণের বহু ছাত্র ছিলেন, যারা ইজতিহাদের যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন।

চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ইজতিহাদ

হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত একদল মুজতাহিদের উদ্ভব হয়, যারা তাদের পূর্ববর্তী ইমামগণের মূলনীতির উপর ভিত্তি করে এমন আহকাম বা বিধানাবলি প্রণয়ন করেন, যা তাদের পূর্বসূরীদের নিকট ছিল না।

পূর্বের স্তরের অনুকরণে পরবর্তীতে একদল আলিমের আবির্ভাব হয়। যারা বিভিন্ন প্রসিদ্ধ মাযাহাব সংকলনে লিপ্ত হন। একই সময় তাদের ইমামগণের বিভিন্ন উক্তি হতে নির্ভরযোগ্য উক্তিগুলো চয়ন করেন। বিভিন্ন মাযহাব সংকলনকারী আলিমগণও ইজতিহাদের যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন।

ইবনে তাইমিয়া (র) হাদীস-ভিত্তিক আমলের দিকে মানুষকে আহবান জানান এবং সালফে সালেহীনের মাযহাবের দিকে মানুষকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেন। তার ছাত্র ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযিয়া, যিনি তাকলীদের ঘোর বিরোধী ছিলেন।

হিজরী সপ্তম থেকে অষ্টম শতকের শেষ পর্যন্ত ইজতিহাদ

অবশ্য হিজরী সপ্তম শতকের শেষ ভাগে এবং অষ্টম শতকের প্রথম দিকে সিরিয়ায় ইবনে তাইমিয়ার আবির্ভাব ঘটে। যিনি হাদীস ভিত্তিক আমলের দিকে মানুষকে আহবান জানান এবং সালফে সালেহীনের মাযহাবের দিকে মানুষকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেন। তিনি মুজতাহিদ হওয়া সত্ত্বেও সর্বদা শরীআতের মূল উৎসদ্বয়, কুরআন ও সুন্নাহর প্রতিই অধিকতর যত্নবান ছিলেন। অন্যান্য শাখা-প্রশাখার দিকে ভ্রুক্ষেপ করতেন না। তারপর আসেন তার ছাত্র ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযিয়া, যিনি তাকলীদের ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং মানুষকে ইজতিহাদের দিকে আহবান জানান। অবশ্য ইবনে তাইমিয়া ও ইবনু কাইয়্যিম হাম্বলী মাযহাব ভুক্ত মুজতাহিদ ছিলেন।

হিজরী নবম ও দশম শতাব্দী পর্যন্ত ইজতিহাদ

হিজরী নবম শতকে মিশরে ইবনে হাজার আল-আসকালানীর আবির্ভাব হয়, যিনি বহু বিষয়ের উপর ফাতওয়া প্রদান করেন। আর তার অনুসরণ করেন তাঁর শিষ্যগণ। এদের শিরোনামে রয়েছেন ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী। তিনি তাকলীদের পক্ষে ফাতওয়া প্রদান করেন। অবশ্য ইবনে হাজার আসকালানী ও জালালুদ্দীন সুয়ূতী শাফিঈ মাযহাব ভুক্ত ছিলেন।

হিজরী দশম ও একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইজতিহাদ

হিজরী দশম ও একাদশ শতাব্দীতে কতিপয় মুজতাহিদের আবির্ভাব হয়, যারা হানাফী মাযহাবের অনুসরণে ইজতিহাদে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। এদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম আবুস সউদ ও ইমাম খায়রুদ্দীন আর-রমলী। এছাড়া এ সময়ে হিন্দুস্থানে আরো কতিপয় আলিমের আবির্ভাব হয়, যারা ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া বা 'ফাতওয়ায়ে আলমগীরী, সংকলন করেন।

হিজরী দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইজহিতোাদ

অনুরূপভাবে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সিরিয়ায় ইবনে আবেদীন, মরক্কোতে যাসুলী ও রাহুনী এবং তিউনিসিয়ায় ইসমাঈল আত-তামিমীর আবির্ভাব হয়। এরা সকলেই মুজতাহিদ পর্যায়ের ছিলেন। এছাড়া এ সময় আরো দু'জন মুজতাহিদের আবির্ভাব ঘটে, তাদের একজন হলেন হিন্দুস্থানের শাহ ওলী উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী এবং ইয়ামানের ইমাম শাওকানী। তারা দু'জনেই ইজতিহাদে নতুনত্ব দান করেন। এদের দ্বিতীয় জন প্রথমে ছিলেন শিয়া যায়দী মাযহাবভুক্ত। পরবর্তীতের সালাফী মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত হন।

হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দী ছিল রাজনৈতিক এবং ইজতিহাদ গবেষণার ক্ষেত্রে মুসলমানদের দুর্বলতার যুগ। এ সময়ে ক্রুসেডে উম্মত্ত সাম্রাজ্যবাদীরা মুসলিম সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণ চালায় এবং তাদের উপর পাশ্চাত্যের আমদানীকৃত আইন প্রয়োগ করে। তখনকার উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলির মধ্যে একটি হল ওহাবী আন্দোলন, যার বিস্তার ঘটে সৌদি আরবে। এ আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে তাকলীদ ছেড়ে ইজতিহাদের দিকে ও সালফে সালেহীনের মাযহাবের দিকে আহবান করা। অনুরূপভাবে আলজেরিয়া ও লিবিয়ায় সানুসী আন্দোলন, আর সুদানে মাহদী আন্দোলন শুরু হয়। এসব আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে ইজতিহাদের দিকে আহবান করা।

হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দী ছিল রাজনৈতিক এবং ইজতিহাদ গবেষণার ক্ষেত্রে মুসলমানদের দুর্বলতার যুগ। তখনকার উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলির মধ্যে একটি হল ওহাবী আন্দোলন, যার বিস্তার ঘটে সৌদি আরবে। অনুরূপভাবে আলজেরিয়া ও লিবিয়ায় সানুসী আন্দোলন, আর সুদানে মাহদী আন্দোলন শুরু হয়। এসব আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে ইজতিহাদের দিকে আহবান করা।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত ইজতিহাদ

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ এবং চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগ তাজদীদ ও ইসলাহে ইসলামের (সংস্কারের) যুগ। এ সংস্কারের আহবান জানান জামালুদ্দীন আফগানী, শায়খ মুহাম্মদ আবদুহ এবং আল্লামা ইকবাল। তাদের সকলের উদ্দেশ্য ছিল একনিষ্ঠভাবে ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তন। কিন্তু এ আন্দোলনে সঠিক আকীদা গড়ে তোলার পাশাপাশি তৎকালীন অবক্ষয় সাধিত রাজনীতির সংমিশ্রণ ঘটে। তারপর আসেন শায়খ রশীদ রিজা, যিনি ছিলেন মুহাম্মদ আবদুহর শিষ্য। ফিক্‌হ সম্পর্কিত ইজতিহাদের বেলায় তার বেশ অবদান রয়েছে।

বর্তমানে মুসলিম সমাজে বহুমুখী সমস্যার উদ্ভব হয়েছে এবং হচ্ছে, যা পূর্বেকার যুগে ছিল না। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইজতিহাদ ও গবেষণা করে এ সব সমস্যার সমাধান দিতে হবে। অন্যথায় মুসলিম সমাজ মানব রচিত মনগড়া আইনের দিকে ঝুঁকে পড়বে।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

► সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. বদরের যুদ্ধে বন্দিদের থেকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া-
   ক. সাহাবীদের ইজতিাহদের প্রমাণ বহন করে;
   খ. রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইজতিহাদের প্রমাণ বহন করে;
   গ. তাবিঈদের ইজতিহাদের প্রমাণ বহন করে;
   ঘ. কোনটাই নয়।

২. রাসূল (স) প্রাপ্ত ওহীর বাইরে-
   ক. ইজতিহাদ করেননি;
   খ. ইজতিহাদ করেছেন;
   গ. ইজতিহাদের প্রয়োজন বোধ করেননি;
   ঘ. ইজতিহাদ করেছিলেন কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে নিষেধের কারণে তা বন্ধ করে দিয়েছেন।

৩. সাহাবীগণ শুধু-
   ক. কুরআনের উপর আমল করেছেন;
   খ. হাদীসের উপর আমল করেছেন;
   গ. কুরআন হাদীসের বাইরে ইজতিহাদ করেছেন;
   ঘ. কুরআন হাদীসের উপর ভিত্তি করে ইজতিহাদ করেছেন।

৪. ইমাম শাওকানী-
   ক. একজন শিয়া পন্থী মুজতাহিদ ছিলেন;
   খ. প্রথমে শিয়া পন্থী ছিলেন পরবর্তীতে সালাফী মাযহাবের মুজতাহিদ ছিলেন;
   গ. সারা জীবন শিয়া পন্থী ছিলেন;
   ঘ. সব সময় সালাফী পন্থী ছিলেন।

৫. ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিয়া-
   ক. ইজতিহাদে কঠোর বিরোধিতা করতেন;
   খ. তাকলীদের চরম বিরোধী ছিলেন;
   গ. কোনটিই ছিলেন না;
   ঘ. ইবনে তাইমিয়ার মতোমতো অনুসরণ করতেন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. রাসূলের (স) দু'টি ইজতিহাদের প্রমাণ দিন।
২. সাহাবীদের দু'টি ইজতিহাদের প্রমাণ দিন।
৩. তাবিঈ ও তাবয়ে তাবিঈর যুগের ইজতিহাদ সম্পর্কে লিখুন।
৪. হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত ইজতিহাদের বর্ণনা দিন।
৫. হিজরী সপ্তম শতাব্দী থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত ইজতিহাদের বর্ণনা দিন।
৬. হিজরী দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত ইজতিহাদ সম্পর্কে লিখুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. ইজতিহাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।